অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

পঞ্চম সংস্করণ

—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬।১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী।

মূল্য ২'৫০ টাকা] [মাশুলাদি স্বতন্ত্র

তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন

জীবনের বিপুল কর্ম্ম-সাধনার অন্যতম অপরিহার্য্য সহায়ক-রূপে যিনি অন্তরঙ্গ সহকর্ম্মীদের নিকটে নিজের ভাব, আদর্শ ও অনুপ্রেরণা পৌঁছাইয়া দিবার জন্যই মাত্র লেখনী ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার অক্লান্ত শ্রম-পরিপূর্ণ জীবনের মধ্যে সাহিত্য রচনার অবসর মিলে নাই বলিয়াই যিনি ভাব ও শব্দ-সম্পদের অফুরন্ত ভাণ্ডার হইয়াও কখনও সাহিত্য-চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই, আর্ত্ত, পতিত, দুঃখ-পীড়িত অগণিত মানব-সন্তানের অন্তর হইতে পশুত্বের নির্ব্বাসন করিয়া যিনি নিরন্তর তাহাদিগকে দেবত্বের শুচি-শুভ্র পথে পরিচালন করিবার জন্য প্রতিবিন্দু শোণিত উৎসর্গ করিতেছেন, যিনি তরুণ কৈশোর হইতে শুরু করিয়া আজ জীবনের পরিপক্ক অবস্থায়ও বিশ্রাম, আরাম ও অবসর প্রার্থনা করেন নাই এবং নিয়তই বলিয়াছেন,—"বিশ্রাম ? তাহা মৃত্যুর পরে হইবে,"—কর্ম্মিষ্ঠতার সেই জ্বলন্ত জাগ্রত বিগ্রহ-স্বরূপ অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের লেখনী-প্রসূত অমৃতবাণী ভারতবাসীর, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী জাতির, নবজাগরণের সাধনায় কি অত্যদ্ভুত উন্মাদনা দিয়াছে, কি অপরিসীম শক্তির সঞ্চার করিয়াছে, তাহা আজ দেশবাসীর সম্যক অবিদিত নহে। নীরবে নিভৃতে নিজ সঙ্গোপন তপঃসাধনায় নিরত রহিয়া যে মহাশক্তিধর নবযুগ-ঋষি দলে দলে তরুণদের প্রাণ হইতে মৃত্যুভয় বিদূরিত করিয়াছিলেন, যাঁহার এক একটী বাণী কণ্ঠে উচ্চারণ করিতে করিতে কত কত মহার্ঘ্য কর্ম্মী অবহেলে দেশমাতৃকার চরণে হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া বিন্দু বিন্দু রক্তকণা সকলের অলক্ষিতে উৎসর্গ করিতেছিল, সেই মহামহর্ষি অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব যাহা কিছু যখনই লিখিয়াছেন,

তাহার প্রায় সবই পত্র মাত্র এবং তাঁহার নানা সময়ের লিখিত পত্র সমূহ সংগ্রহ করিয়াই কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া এমন এক সজীব সচল প্রাণবন্ত সাহিত্য রচিত হইয়াছে, যাহা বাংলা সাহিত্যের দৃঢ়তা-বর্দ্ধক হইয়াছে, ভারত-মনে নবাদর্শবাদের রেখাপাত করিয়াছে। সাহিত্যিকতার সৃজন-ধর্ম্মে নহে, মহাকর্ম্ম সাধনের জীবন-ধর্ম্মে এই সকল রচনার সৃষ্টি বলিয়াই ইহাদের প্রত্যেকটীর মধ্যে ভাবী কালের অনন্ত কর্ম্মযজ্ঞ সমূহের সম্ভাবনা সমূহও লুক্কায়িত রহিয়াছে। একথা আজ অভিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, ধীমান্, ব্যক্তি মাত্রেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন। অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের যে সকল পত্র প্রায় অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে এবং কোনও রূপ রূপান্তর সাধন না করিয়া যাহা পত্র রূপেই প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে "আপনার জন" স্বাক্ষরিত পত্রাবলি একটী বিশেষ কারণে জনপ্রিয়তায় একটী বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। আমরা সেই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত করিতে পারিয়া নিজেদিগকে ধন্য মনে করিতেছি।

"আপনার জন" এই নাম স্বাক্ষর করিয়া পরমপূজ্যপাদ অখণ্ড-মণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব বাংলা, ১৩২৯-৩০ সালে যে পত্রগুলি লিখিয়াছেন, তাহার এগার খানা বাংলা ১৩৩১ সালে সর্ব্বপ্রথম "আপনার জন" নামে প্রকাশিত হয়। ১৩২৯-৩০-৩১ বাংলা সালে লিখিত আরও সতেরখানা পত্রসহ "আপনার জন" বাংলা ১৩৩৫ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বহু স্থান অন্বেষণ করিয়া সম্প্রতি আমরা "আপনার জন" স্বাক্ষরিত আরও সাতখানা তৎসাময়িক পুরাতন পত্র পুনরুদ্ধার করিয়াছি। তাহাও আমরা এই পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণে সংযোজিত করিয়া দিলাম। বিশেষতঃ, যে সকল পত্রের তারিখ পাওয়া গিয়াছে, উহাদের তারিখও সম্ভব মতন সংযোজিত

হইল। দুইখানা চিঠির যে অংশ-বিশেষ পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণে ভ্রমক্রমে পরিত্যক্ত হইয়াছিল, এবার তাহাও সংগ্রথিত হইল।

বাংলা ভাষায় অনেকেই অনেক মূল্যবান্ ও রসাল গ্রন্থ লিখিয়াছেন। কিন্তু প্রকাশ মাত্রই সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পুস্তক নিঃশেষ হইয়া যাইবার দৃষ্টান্ত অতীব বিরল। অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস-দেবের রচনা সমূহ সেই বিরল দৃষ্টান্তই সর্ব্বদা স্থাপন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু "অযাচক আশ্রম" অযাচক বলিয়াই কোনও একটী সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যাইবার পরে সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ সম্ভব হইয়া উঠে নাই। একমাত্র এই কারণেই এই মূল্যবান গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ আমরা আরও আগে প্রকাশ করিতে সমর্থ হই নাই।

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবই ভারতের সর্ব্বপ্রথম কর্ম্মযোগী সন্ন্যাসী, যিনি জীবহিতে তনুমন সমর্পণ করিয়াও নিজের বিপুল কর্ম্মোদ্যমকে ভিক্ষাপ্রার্থনার সহিত আপোষ করিতে দেন নাই। ভারতের প্রত্যেকটী যুবকের জীবনে সংযম, শক্তিমত্তা ও পরার্থ-প্রেরণার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি দেরাদুন হইতে সদিয়া পর্য্যন্ত বিরাট ভূখণ্ডে উল্কার বেগে ভ্রমণ করিতেছেন, ঝড়ের বেগে তিনি তমোনাশী ভাষণ সমূহ প্রদান করিয়াছেন, পার্ব্বত্য দেশ সমূহের আরণ্য অধিবাসীদের মধ্যে তিনি বৈদিক ধর্ম্মের বিজয় বৈজয়ন্তী লইয়া অগ্রসর হইয়াছেন, ধর্ম্মভ্রষ্টকে তিনি ধর্ম্ম দিয়াছেন, পথচ্যুতকে তিনি পথে আনিয়াছেন, এক একটী ব্যক্তিমাত্রকে লইয়াই মাত্র নহে, এক একটী সমাজকে ধরিয়া তিনি প্রবল আকর্ষণে টানিয়া কাছে আনিয়াছেন, বুকে ধরিয়াছেন, নিকট আত্মীয় করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নিজ জীবনে ভিক্ষা প্রার্থনার, পরমুখাপেক্ষিতার বা পরানুগ্রহ-কামনার কণা মাত্র স্থান তিনি রাখেন নাই, এবং যাহাদিগকে তিনি শিক্ষা-দীক্ষা দিয়া মানুষ করিয়া গড়িয়া

তুলিয়াছেন, তাহাদের মনের মধ্যেও এই দৌর্ব্বল্যকে থাকিতে দেন নাই। ভারতের গৃহীকে তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রমূর্ত্ত অবতার-স্বরূপ আত্মপ্রকাশ করিবারই দিয়াছেন দিব্যপ্রেরণা, ভারতের সন্ন্যাসিগণকে ভবিষ্য-যুগের কর্ম্মযোগিগণের আদর্শ স্বরূপ গঠন করিবার তিনি দিয়াছেন অত্যুজ্জ্বল আদর্শ। নবযুগের নবজাগরণকে তিনি স্বয়ম্প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া পরিচালিত করিবারই এক অপূর্ব্ব সাধনা করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে এই সাধনা আর কেহ করেন নাই, এবং ইহার পরে এই সাধনার পন্থানুবর্ত্তন করিবেন লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি কর্ম্মযোগী ও তপোব্রত মহাসাধকেরা। শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দের জীবনের মধ্যে নবমহা-জাতির জন্য ইহাই হইবে এক অনবদ্য, অনুপম, অত্যুচ্চ দিগ্‌দর্শন। "অভিক্ষা" শব্দ তাঁহারই এক কীর্ত্তিমতী তথা কৃতিময়ী সৃষ্টি এবং "অভিক্ষার" অনুসরণ তিনি নিজ জীবনে যে নিদারুণ নিষ্ঠা সহকারে করিয়াছেন, তাহাই ভাবী কালে সকল কর্ম্মযোগীকে সাহস দিবে, বল দিবে, উদ্যম দিবে ও তাঁহাদের প্রাণে উৎসাহের সঞ্চার করিবে।

"আপনার জন" গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদনে নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা মুদ্রিত হইয়াছিল।

"ভারতবর্ষময় গার্হস্থ্য জীবনের যে বিপর্য্যয় এবং গৈরিকের যে অকথনীয় অপব্যবহার চলিয়াছে, তাহা প্রত্যেক সহৃদয় চিন্তাশীল ব্যক্তির ভাবনার এবং প্রতীকারের বিষয়। বিবাহ করিলেই যে প্রকৃত গৃহস্থ হওয়া যায় না, গেরুয়া পরিলেই যে সন্ন্যাসী হয় না, একথা আজ দেশকে বুঝাইয়া দিবার পন্থা না পাইলে, জাতীয় ভবিষ্যৎ ঘোরতিমি-রাচ্ছন্ন। বিবাহিত জীবন যে কামচরিতার্থতার জন্য নয়, সন্ন্যাসগ্রহণ যে ভিক্ষার্জ্জনের জন্য নয়, এ কথা লেখা বা বক্তৃতায় ক্ষীণভাবে কেহ বলিয়া থাকিলেও কথাতেই কুলাইবে না। গৃহীর মেরুদণ্ড আজ কেন

ভাঙ্গিয়া গেল, সন্ন্যাসীকে আজ কেন লোকেরচক্ষে হীন প্রবঞ্চক হইতে হইল,—এই প্রশ্নের মীমাংসা শুধু কথায় হইবার নহে। নিরুপায় অপুরুষ গৃহীকে যেমন উপায় নির্দ্দেশ করিতে হইবে, মেকী সাধু, মিথ্যা সন্ন্যাসী, ঝুটা বৈষ্ণব, লোক-ভুলান বাউল ও পেটের দায়ে ফকীর প্রভৃতিকেও তেমন যথার্থ সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।"

এই মীমাংসাই হইবে অভিক্ষায়, মীমাংসা হইবে স্বাবলম্বনে, মীমাংসা হইবে অযাচক-বৃত্তিধারী কর্ম্মযোগসাধকেদের কর্ম্মযোগসিদ্ধিতে। তাই শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের আশ্রমের কর্ম্মীরা তাঁহাদের পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে তাঁহারই সহিত সমযোগে একমাত্র স্বাবলম্বননিষ্ঠ বাহুবল আশ্রয় করিয়া বীর-বিক্রমে প্রস্তর-কঙ্কর-পূর্ণ মৃত্তিকায় গাতি-কোদাল চালাইয়া শক্ত মাটির দম্ভ চূর্ণ করিয়াছেন, কোনও দিন কাঁচা ঝিঙ্গা চিবাইয়া, কোনও দিন ঢেঁড়শ পাতা সিদ্ধ করিয়া, কোনও দিন অখাদ্য তিক্ত-কটুস্বাদ পলাশ ফুলের চর্চ্চরী রাঁধিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করতঃ "অভিক্ষার" বৈজয়ন্তীকে বিজয়শ্রীমণ্ডিত করিবার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছেন। বিদ্যাদান, জ্ঞানদান,, ধর্ম্মপ্রচার, নৈশ কথকতা, দেশে বিদেশে ভ্রমণ, পাহাড়-পর্ব্বত, বন-জঙ্গল মন্থন করিয়া জাতিতে জাতিতে ভেদবুদ্ধির বিমর্দ্দন, কৃষি-প্রচার, বীজ-বিতরণ, বৃক্ষরোপণ প্রভৃতির দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে আর্থিক উন্নতির সহায়ক নানাবিধ প্রচেষ্টা অবিরামই শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেকটী কর্ম্মকেন্দ্র হইতে বিগত বাংলা ১৩৩৪ সাল হইতে নিরবচ্ছিন্নভাবে হইয়া আসিতেছে। বিগত ১৩৩৮বাংলা সনে একমাত্র পুপুন্‌কী আশ্রম হইতেই মানভূম জেলাতে এক লক্ষ ফলবৃক্ষের চারা বিতরণ হইয়াছিল, যাহা দৃষ্টান্ত হিসাবে অপূর্ব্ব এবং দেশ-সেবার হিসাবে অনুপম। আজ যাহা বনমহোৎসব করিয়া রাষ্ট্রনেতাদের করিতে

হইতেছে, চব্বিশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ তাহাই বিপুল সফলতার সহিত করিয়া আসিতেছেন। রিয়াং, মলস্থুং, প্রভৃতি জাতির ভিতরে ধর্ম্মপ্রচার কি টাকার অভাবে বন্ধ হইয়া আছে? নাই। অযাচক সন্ন্যাসী অভিক্ষার শক্তিতে শক্তিমান হইয়াই গিরিকান্তার লক্ষ্য করিয়া দূর-দূরান্তরে যাইতেছেন এবং সকলকে আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী করিবার সফল প্রয়াস পরিচালিত করিতেছেন। হিন্দু ধর্ম্মের এক নবজাগরণ আজ এক অমোঘ ঐশী শক্তির দিব্য প্রভাবে সঙ্ঘটিত হইতেছে। ভারতের প্রাচীন ঋষির চিরগৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য আজ নবগৌরবপ্রদীপ্ত হইয়া অভ্যুত্থান লাভ করিতেছে। বৈদিক ভারত পুনরভ্যুদয় লাভ করিতেছেন। শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দের প্রাণের আকুতি এই যে,—নিখিল ভুবন আর্য্য কৃষ্টির উত্তরাধিকারী হউক!

কথার সহিত কর্ম্মের যেখানে সামঞ্জস্য আছে, বর্ত্তমান গ্রন্থ তেমনই ঋষিজীবন হইতে প্রসূত। মিথ্যার সহিত আপোষ-বর্জ্জিত শুদ্ধসত্ত্ব, শুচিস্নাত, নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ এক মহাজাতির সৃষ্টি যাঁহার স্বপ্ন, বল-দুর্দ্ধর্ষ এক নবমহামানবগোষ্ঠীর দ্বারা বিশ্বমানবের জন্য অকাতরে প্রাণদান করাইয়া দেবত্বের বিরাট অভিযান পরিচালন যাঁহার অনুধ্যান, এই গ্রন্থ তাঁহারই রচনা। জীবন ভরিয়াই যিনি লোকসেবা করিয়া কাটাইতেছেন, মৃত্যুর পূর্ব্বে যিনি নিমেষের জন্যও বিশ্রাম চাহেন না, ছোটকে বড় করিবার, নীচকে উচ্চ করিবার, দুর্ব্বলকে সবল করিবার সাধনাই যাঁহার জীবনের একমাত্র তপস্যা, শতযুগব্যাপী অধঃপতনের গ্লানি মুছিয়া ভারতকে যিনি পুনরায় জগতের গুরুর আসনে বসাইতে চাহেন, এ গ্রন্থ তাঁহারই রচনা। তাই আমরা অকপটে বিশ্বাস করি, এই গ্রন্থ পাঠ সকলের শুভবর্দ্ধক হইবে। ইতি—পৌষ ১৩৫৭

অযাচক আশ্রম,
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট
বারাণসী।

বিনীত
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
স্নেহময় ব্রহ্মচারী

পঞ্চম সংস্করণের নিবেদন

অনেক দিনের কথা। ভারতের ললাটে পরাধীনতার কলঙ্ক-কালিমা লেপিত, বাংলার বুকে উদ্ধত ইংরাজের নিদারুণ নির্য্যাতনের চলিতেছে নির্ম্মম তাণ্ডব। দেশব্যাপী নীরন্ধ্র অন্ধকারের চলিতেছে রাজত্ব। সমগ্র ভারত নিদ্রিত, বাংলামায়ের দুই চারিটী দুর্লভ সন্তান নির্ভীক কণ্ঠে মাঝে মাঝে বজ্র-নির্ঘোষে শুনাইয়া যাইতেছে জাগরণের আবাহনী গীতি। আর, লোকচক্ষের অন্তরালে এদিকে সেদিকে নক্ষত্র-ঝলকের মতন মাঝে মাঝে দুই একটী তরুণ-চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া অপর তরুণদের কাণে কাণে কহিয়া যাইতেছে,—"ভাই জাগো"। কেহ কাহারো পরিচয় জানে না, কেহ কাহারো পরিচয় চাহে না, চাহে শুধু হৃৎপিণ্ড উজাড় করিয়া দেশ-মাতৃকার চরণমূলে বক্ষ-শোণিতের অঞ্জলি দিতে। কেহ কেহ অগ্নিনালিকা হাতে তুলিয়া লইয়াছিলেন দুর্ব্বৃত্ত দমনের জন্য; অত্যাচারীর নিধনের জন্য।

কিন্তু সকলেই কিছু অস্ত্র ধারণ করেন নাই। কেহ কেহ ভিন্ন পথ ধরিয়াছিলেন, কেহ কেহ লেখনীকে অগ্নিনালিকার অপেক্ষ্যা অধিকতর শক্তিশালিনী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই একজন লিখিয়াছিলেন, "তেমনি গান গাহিতে চাহি, যেগান শুনিয়া সুপ্তিমগ্ন জাগিয়া উঠিবে, মুগ্ধ হইবে, কর্ম্মৈষণার প্রচণ্ড তাড়নে ভাঙ্গিবে গড়িবে কিন্তু কে যে কোন্ গোপন পুরে বসিয়া রাগিণী আলাপ করিয়া গেল, তাহা অনুমানেও না আনিতে পারে।" (কর্ম্মের পথে)

আচার্য্য স্বরূপানন্দ আবাল্য পত্রলেখক। জীবনের প্রথমাংশের পত্র-গুলি "আপনার জন" এই ছদ্মনামে লিখিত হইত। একখানা পত্র লিখিয়া ভিন্ন ভিন্ন হস্তে তাহার শত শত প্রতিলিপি করাইয়া নানা জেলায় নানা স্থানে যুবকদের নামে নামে প্রেরিত হইত। সে এক বিচিত্র কর্ম্মতৎপরতা। কেহই জানিতে পারিত না, কে বা কাহারা কোথা হইতে মাসের পর মাস অশেষ ধৈর্য্য সহকারে এই সকল প্রাণোন্মাদিনী পত্র-সুধা সিঞ্চন করিয়া যাইতেছেন। একদা বাংলায় এক ইতিহাস রচিত হইতেছিল, যেই ইতিহাসকে বর্ত্তমান ভারতের নেতারা এখনও সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। কিন্তু সেই অলিখিত উজ্জ্বল ইতিহাসের একটী অধ্যায়ে স্বর্ণাক্ষরে দেদীপ্যমান হইয়া রহিয়াছে একটী দীপ্তি-সমুজ্জ্বল নাম,—"আপনার জন"।

"আপনার জনের" প্রথম দিকের বিংশ সহস্রাধিক পত্রের কোনও নকল রক্ষণ সম্ভব হয় নাই। সুতরাং জোয়ার-জলের নমুনা উপহার দেওয়া সম্ভব হইল না। যখন ভাটা লাগিয়া আসিয়াছে, তখনকার দিনের কয়েকখানা পত্রের অনুলিপি দৈবক্রমে মিলিয়া যাওয়ায় "আপনার জন" একটু ঐতিহ্য রক্ষা করিয়াছে, এই মাত্র।

চতুর্থ সংস্করণ ১৩৭৩ এর বৈশাখে প্রকাশিত হইয়াছিল। আনন্দের সহিত "আপনার জন" পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করিতেছি। নিখিল বিশ্ব আমাদের "আপনার জনে" ভরিয়া যাউক।

ইতি—বৈশাখ, ১৩৮২

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট
বারাণসী

বিনীত
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
স্নেহময় ব্রহ্মচারী

আপনার জন

—✪✪✪—

প্রথম পত্র

পরমপ্রেমাস্পদ—

* * * তরল দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে ইহাই মনে হয় যে, তুমি এবং আমি পরস্পর অপরিচিতই ছিলাম। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি যদি ভগবান দয়া করিয়া দেন, তবেই নির্ভুলরূপে দেখিতে পাই যে, তুমি আমি অপরিচিত নহি, একে অন্যের অন্তরের অন্তর ব্যাপিয়া নিত্য-প্রীতির পাথারে ডুবিয়া রহিয়াছি। আমরা অপরিচিত নহি। অপরিচিত নহি বলিয়াই কেহ কিছু না বলিতে একে অন্যকে চিনিয়াছি, একে অপরের জীবনধারার উন্মুখতা টের পাইয়াছি। অপরিচিত নহি বলিয়াই, কেহ কিছু শিখাইয়া দিবার আগে আমি তোমাকে ভালবাসিয়াছি, তুমি আমাকে ভালবাসিয়াছ। তোমার কাছে ভালবাসার প্রতিদান পাইব বলিয়া আমি ভালবাসি নাই, আমার কাছে প্রতিদানের আশা করিয়া তুমি মনে মনে তোমার স্নেহ-উন্মুখ চিত্তকে আমার বুকের মাঝে সঁপিয়া দাও নাই। আমার বুকের মাঝে তোমার মাথাটী আগেই গোঁজা ছিল বলিয়া, নিমেষের মাঝে তোমাকে পাইয়াছি, নতুবা উহা অত সোজা হইত না। * * * প্রাণে

প্রাণে মিশামিশি করিয়াই আমরা অনন্তকাল রহিয়াছিলাম, তাই মিশামিশি করিয়াই আমরা অনন্তকাল রহিব।

* * * *

তুমি লিখিয়াছ, "ম"—যদি সোণা হয়, তবে তুমি লোহা। এই কথা বিনয়ের পরিচায়ক বটে। কিন্তু আমি বলিতেছি যে, 'ম'—যদি সোণা হইয়া থাকে, তবে যেন আজ হইতে শ্রীশ্রীপ্রভুর আশীর্ব্বাদে লোহাই হয়। তুমি এবং ম—উভয়েই লোহাই হও, শক্ত হও, দৃঢ় হও, অনমনীয় হও, অপরাজেয় হও। সোণা দিয়া কি করিব বাছা? সোণা লইয়া মানুষে মানুষে কত কলহ, কত কোলাহল সভ্যতা-সৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত্ত হইতে হইয়া আসিতেছে। কাঞ্চন চিরকাল মানুষের লালসার জাল ছড়াইয়াছে, বাসনার বন্ধন শক্ত করিয়া দিয়াছে। আমরা কাঞ্চন চাহি না, চাহি লোহার টুক্‌রা। কোনও আঘাতে টলিয়া যায় না, কোনও বেদনায় ঢলিয়া পড়ে না, আগুনের তাপে গলিতে চাহে না, তেমন লোহা চাই। লোহার সাথে উপযুক্ত গুরুর সহায়তায় উপযুক্ত মশলা মিশ্রিত হইলে, ইহা ইস্পাত হইবে; নীচতা, হীনতা, দীনতা, মলিনতা সকলই নিমেষের মাঝে কাটিয়া ফেলিবার শক্তি ইস্পাতেরই আছে, সোণার নাই। সোণার গহনা গায়ে দিয়া অহঙ্কারে গদগদ হওয়া সহজ, ভূমিতে পদক্ষেপ করিতে নারাজ হওয়া সহজ, সোণার বিনিময়ে জগতের সকল পাপ, সকল অশান্তি ডাকিয়া

আনা সহজ, কিন্তু লক্ষযুগের জড়তা যে জাতির সর্ব্বাঙ্গে ছাইয়া পড়িয়াছে, আঘাতের পর আঘাতে সে জাতিকে জাগ্রত ও কর্ম্মপরায়ণ করিতে পারে একমাত্র লোহা। লোকে সোণারই বেশী আদর করিতে পারে, কিন্তু আমি লোক নহি,—আমি অলোক, অমানুষ। আমি সোণার আদর করি না, একমাত্র লোহারই কদর বুঝি। যেদিন আমার গুদামের দরজার তালা, চাবি দিয়া খুলিয়া দেখাইতে পারিব, সেদিন দেখিবে, আমার গুদামের দরজাই শুধু লোহার, তালা-চাবিই শুধু লোহার, তাহা নহে, আমার গুদাম ভরা শুধু লোহা—লোহা—লোহা—। কোথাও এককণা সোণা নাই, একটি হীরামাণিক্য বা মুক্তা-জহরৎ নাই। * * * আমি সোণার গৌরাঙ্গ অপেক্ষা লোহার ভীম বেশী ভালবাসি।

সোণার উপরে পারদ মাখাইলে, সোণা নষ্ট হইয়া যায়, তার প্রতি অণুপরমাণু পারদে সিক্ত হইয়া যায়, কিন্তু লোহার উপরে পারদ মাখাইলে লোহার একটি কণাও নষ্ট হয় না, বরং তাহার ঔজ্জ্বল্য বাড়ে। সোণার ছেলে চাহি না, কারণ, প্রলোভনের পারদ গায়ে লাগিয়ে সোণার ছেলে আর সোণার থাকে না, সে তখন পারদের ছেলে, প্রলোভনের ছেলে হইয়া যায়। লোহার ছেলের গায়ে প্রলোভনের পারদ লাগিলে সে তখন পূর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল হয়, তার জীবনের জীবন্ত গরিমা না মরিয়া বরং বেশী করিয়া বাঁচিয়া উঠে। যে ছেলে কেবল মাটীর

দিকে চাহিয়াই চলে, পথ চলিতে চলিতে দশবার সশঙ্ক চিত্তে পথের পাশে আসিয়া দাঁড়ায়, পশ্চাদ্‌বর্ত্তীকে আগে যাইতে দিয়া নিজে পিছাইয়া পড়ে. যে ছেলে অন্যায় শুনিলে প্রতিবাদ করিতে জানে না, যে ছেলে অসৎ অনুষ্ঠানের বিদ্রোহী হইয়া সিংহগর্জ্জন করিতে ভালবাসে না, যে ছেলে জগতের দ্বন্দ্বসংঘর্ষের মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়া পরানপেক্ষী আত্মশক্তিতে বিক্ষুব্ধ সাগর-তরঙ্গ শান্ত করিবার হাঙ্গামা মাথা পাতিয়া নিতে চাহে না, দুঃখকে যে এড়াইয়া চলে, বাধাতে যে এলাইয়া পড়ে, তেমন সোণার ছেলে স্বর্ণান্বেষী অর্থের গোলামের কোলেই শোভা পাউক ; লোহার ভাই, লোহার বন্ধু, লোহার শিষ্য, লোহার পুত্রগণ আমার ক্রোড় জুড়িয়া, বুক জুড়াইয়া আসিয়া বসুক। আমার বুকের পাঁজরগুলি কামানের কারখানার ইস্পাত দিয়া গড়া, আমার বুকে সোণার ছেলে আসিয়া প্রাণে বাঁচিবে না, একটি মাত্র আদরের পেষণে একেবারে দলামাটি মুচিঘুচি, গুড়াচুড়া হইয়া যাইবে। আমি নিজেই যে আদৌ সোণার ছেলে নই, ঘোরতর লোহার ছেলে ; মধ্য-ভারতের কোল, ভীল, সাঁওতালরা নিজেরা খনি হইতে লোহা তুলিয়া নিজেদের হাতে একেবারে সাঁওতালি ঢংয়ে আমাকে বানাইয়াছে। আমাতে সভ্যজনের মোলায়েমত্ব নাই, শিক্ষিতের আদব-কায়দা নাই, সব একেবারে জংলী, সব পূর্ণতঃ বন্য। নিজের সহিত সভ্য জগৎকে আমি বারংবার সন্তর্পণে মিলাইয়া তৌল

করিয়া দেখিতে চেষ্টা পাইয়াছি। আমি যেন অনুভব করিয়াছি, সেখানে আমি যেন ঠিক ঠিক মত খাপ খাইয়া উঠি না। মিলন-পথে আত্ম-বিনিময়ে কোথায় জানি খোঁচ, কোথায় জানি খাঁজ রহিয়া গিয়াছে। অসভ্য বন্য পার্ব্বত্য নাগা, কুকি, লেপচা, ভুটিয়া, কোল, ভীল, ওরাওঁ, সাঁওতাল, রিয়াং, মলসুং, কাইফেঙ্গ, এরাই যেন আমার বেশী নিকট, বেশী আপন, এরাই যেন আমাকে বেশী বুঝিবে, বেশী ভালবাসিবে। আমার বাহুযুগ যেন প্রসারিত হৃদয়ে ইহাদেরই অভ্যর্থনা করিয়া বুকে টানিয়া আনিবার জন্য উদ্যত হইয়া রহিয়াছে।

* * * *

হে আমার লোহার বাছা, তোমাকে আমি ইস্পাতের বাছা দেখিয়া ধন্য হইতে চাই। অতীতের কোনও অসাফল্যকে যে জন ভবিষ্যৎ-নির্ম্মাণকালে প্রাণের কোণে ঠাঁই দেয় না, হতাশাকে যে গৃহের চতুঃসীমার মধ্যে আসিতে দেয় না, নিঃসঙ্গতাকে যে গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না, সকলের উপেক্ষা ও বিদ্রূপ যাহার কর্ম্মের একনিষ্ঠার চরণ-নখরে ঠেকিয়াই ঠিকরিয়া পড়ে, প্রলোভন যাহার অক্ষিদীপ্তিতে ভস্মসাৎ হইয়া যায়, তেমন ইস্পাত। সত্য কথা নির্ভীক কণ্ঠে বলিতে যাহার দ্বিধা নাই, নিজের উন্মুক্ত দীর্ণ বক্ষে বজ্রপতন নির্দ্ধারিত জানিয়া সত্যানুসরণ করিতে যাহার শঙ্কা নাই, অবিচল কণ্ঠে জগৎ-

কল্যাণী মহাবাণী প্রচার করিতে যাহার ভীতি নাই, সহস্র বিঘ্নের উল্কাপাতের মধ্যেও লক্ষ্য-লাভ-প্রযত্নে যাহার বিন্দুমাত্র বিহ্বলতা নাই, লক্ষ্য যুগ অপরিসীম শ্রমে পীড়িত হইয়াও যাহার অবসন্নতা নাই, বিষাদের ঘনান্ধকারের মধ্যে রহিয়াও যাহার বিষন্নতা নাই, তেমন ইস্পাত। দুঃখকে যে কর্ম্ম বলে সুখের সৌধে পরিণত করে, দৈন্যকে সমৃদ্ধির আকর বলিয়া গ্রহণ করে, অন্ধকারকে যে আলোকের দ্বার বলিয়া প্রমাণিত করে, তেমন ইস্পাত। তুমি তেমন হইতে পার না কি ?

তুমি আমার কাছে অকপট হইবেই, কারণ, আমি অকপট হইয়াছি। তোমার জীবনের অবগুণ্ঠনরিক্তা সরলতাই তোমাকে সত্য, সুন্দর এবং শিবময়ের চরণ সমীপে নিয়া সমুপস্থিত করিবে। ঢাকাঢাকি ফুরাইয়া যাক্, অসরলতা পথের ধুলিতে লুটাইয়া কাঁদিয়া মরুক, কপটতার রাজ্যে হাহাকার উত্থিত হউক।

আমার বিশ্বাস, পরমঙ্গলময় পরমানন্দ পুরুষ তোমার কল্যাণের প্রহরা দিতেছেন।

আশীর্ব্বাদক

তোমারই আপনার জন।

দ্বিতীয় পত্র

২৩শে ফাল্গুন, ১৩২৯

পরমপ্রেমাস্পদ—

* * * *

ভগবানের আদেশে আমি নিত্য-যৌবনের উপাসক, তাই আমি তোমাদের ভিতরে যৌবনের উন্মেষ দেখিয়া নয়ন সার্থক করিতে চাই। যে যৌবন নিজের ভিতরে অনন্ত স্ফূর্ত্তি পাইয়া নিজেকে নিষ্কাম নিঃস্বার্থ প্রেরণায় জগন্ময় ছড়াইয়া দেয়, স্বার্থসংস্কারের সকল পাশবন্ধন ছিন্ন করিয়া ত্যাগের রেশমে-রচা প্রেমের রজ্জু দিয়া সবাইকে জড়াইয়া ধরে, তেমন যৌবনকে আমি তোমার জীবনের জাগ্রত কর্ম্মৈষণায় দেখিতে চাই। কারণ, যথার্থ যৌবনই জরার অকথ্যকথন বেদনা হইতে অমৃতের পুত্রকে সুরক্ষিত রাখে।

তোমরা ত' বলিয়া আসিয়াছ, যৌবন অতি বিষম কাল। যৌবনই জীবনের যত অকল্যাণকে ডাকিয়া আনিয়াছে, এই কথাই তোমরা বিশ্বাস করিয়া আসিতেছ। যৌবনকে তোমরা আপাত-মধুর, পরিণামবিষ এবং আশুপ্রতারক বলিয়া বুঝিয়াছ। কিন্তু আমি তোমার কাছে যৌবনেরই বার্ত্তা লইয়া আসিয়াছি।

যৌবন কাকে বলি?—জীবনের যে অংশে আমার সুপ্ত প্রকৃতি প্রবল উচ্ছ্বাসে জাগিয়া উঠিয়া জগৎকল্যাণে লাগিয়া সার্থক হইতে চাহে, তাহার নাম যৌবন। এ যৌবন বয়সের বিচার

মানে না, অঙ্গ-মাধুরীর অপেক্ষা রাখে না ; ইহার নির্দ্দিষ্ট কোনও কাল নাই। যে যৌবনের জোয়ারের জলে জগতের যাবতীয় আবর্জ্জনা তরঙ্গে তরঙ্গে খেলিয়া বেড়ায়, ইহা সে যৌবন নহে। যে যৌবন অখণ্ড আনন্দস্বরূপ, উদ্দাম স্বাধীনতাস্বরূপ, উন্মুক্ত ঔদার্য্যস্বরূপ, ইহা সেই যৌবন। যে যৌবন নির্ভয়, যে যৌবন নির্ভুল, ইহা সেই যৌবন। যৌবনের ব্যভিচার নহে,—যথার্থ যৌবনকে আমি আমার ভিতর, তোমার ভিতর এবং সমগ্র বিশ্ব-বাসীর ভিতর দেখিতে আকাঙ্ক্ষী। আমি অনংশ-জীবনে অখণ্ড যৌবন সম্ভোগ করিতে চাই,—যৌবনকে কাটিয়ে কুটিয়ে ছোট করিয়া খর্ব্বিত অংশের মধ্যে অখণ্ডোপলব্ধির অভিনয় করিতে চাই না। অনন্তের রস পাইতে হইলে অনন্ত রসনা চাই, অনন্তের রূপে বিভোল হইতে হইলে অনন্ত আঁখিতারা চাই, অনন্তের অঙ্গের মধুর পরশ পাইতে হইলে নিজের মধ্যেই অনন্ত অঙ্গের স্ফুরণ চাই। যৌবন ইহা দেয়, সেই যৌবনই আমার যৌবন।

যৌবন আমার অঙ্গের বিকাশ করে,—বহিরঙ্গ শান্ত করে, অন্তরঙ্গ সুন্দর করে, সর্ব্বাঙ্গ শীতল করে, তাই সে অনঙ্গের বৈরী। আমার যৌবন অনঙ্গের সহচর নহে। এ যৌবন চির-সুন্দরকে লাভ করে বলিয়াই সকলের কাছে চিরসৌন্দর্য্যকে বহিয়া আনে, চিরমধুরের চরণ-ধূলায় রঞ্জিত বলিয়াই সকলের মাঝে চিরমাধুর্য্য জাগাইয়া দেয়। যৌবন যাহাকে অভিনন্দন দিয়াছে, তার মত সুন্দর আর কে আছে? তার মুখের কথার মত

মধুর কথা আর কোথায় পাই? তার দেহের ছায়াটুকুর মত শ্রান্তির ক্লান্তিহর শীতল স্নিগ্ধ ছায়ার খবর আর কি জানি?

সামান্য যার দৌলত, সে তাহা লোহার সিন্দুকে কুলুপ মারিয়া রাখে; অনন্ত যার ঐশ্বর্য্য, সে তাহা লুকাইবার স্থান পায় না বলিয়া জগৎ জুড়িয়া জনে জনে বিলাইয়া দেয়। কিন্তু তবু তার ঐশ্বর্য্য কণামাত্র কমিতে চাহে না। কারণ, অপরিমেয়কে অংশিত করিলেও তাহা মুষ্টিমেয় হয় না।—এই ক্ষুদ্র ধনীর পুঁজির নাম জরা, আর এই অনন্ত ঐশ্বর্য্যাধিকারীর সম্পদের নাম যৌবন।

যৌবন কখনও দুর্ব্বল হয় না, যৌবন কখনও হতাশায় ডোবে না, তাই একবার জাগিয়া উঠিলে অলস অকর্ম্মণ্যকেও নিজ প্রভাব হইতে বঞ্চিত রাখিয়া যায় না; লক্ষ যুগের শ্লথতার শৃঙ্খল সে জীবন্ত আবেগে ভাঙ্গিয়া চূরিয়া উদ্দাম, উন্মুক্ত ও স্বাধীন হয়—কোথাও বা বিপ্লবের তরঙ্গ-তাড়নে বিশ্বসংসার গুঁড়াইয়া, কোথাও বা প্রেমের মোহন মৌঞ্জীমেখলায় বাঁধিয়া ছাঁদিয়া জড়াইয়া।

যৌবনের অধিকার লইয়া জীবন ও মৃত্যুতে, উত্থান ও পতনে নিত্যকাল কাড়াকাড়ি লাগিয়া আছে। নিজের প্রভাবের বেষ্টনী দিয়া উভয়েই যৌবনের অংশহর হইবার জন্য মামলাবাজ মক্কেলের মত ফাঁকফন্দী খুঁজিতেছে। আমরা যদি অকথায় কুকথায় মনকে অপবিত্র করি, অকাজে কুকাজে মজিয়া দেহমন

কলুষিত করি, যৌবন পতনের পথে চলিবে। সে পথ, পড়িবার সময়ে অকণ্টক ; কিন্তু অকণ্টকে সে পথ হইতে উত্থান হয় না। একবার পড়িতে থাকিলে, যৌবন কেবল পড়িতেই চায়, কেবল নামিতেই চায়। মরুত্ত-যজ্ঞে হবিঃ-পান করিয়া অগ্নিদেবের অগ্নি-মান্দ্য হইয়াছিল বলিয়াই যে কামকে উপভোগ করিতে করিতে কামের কখনও অক্ষুধা জন্মিবে, ইহা মনে করিও না। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পতনধর্ম্মী যৌবন সত্যিকার যৌবন নয়।

—অক্রোধ, অকুণ্ঠ-চিত্ত, অক্লেশ হৃদয়,
কামের অজেয় নিত্য, নির্লোভ নির্ভয়।

ইহাই প্রকৃত যৌবন।

ভাল আছি। তোমার কুশল দিও। ইতি

আশীর্ব্বাদক—
তোমার আপনার জন।

তৃতীয় পত্র

পরমপ্রেমাস্পদেষু ....,

তোমার কোন বাধাবিপত্তি প্রকৃতই থাকিবে না; সকল বক্রতা সরল হইবে, সকল অবসাদ প্রসন্নতায় হাসিবে। ভগবানের কাছে নিজের দায়িত্ব, নিজের কর্ত্তৃত্ব, নিজের অহংবোধ ছাড়িয়া দাও ; নিজেকে ভগবানের নামে সঁপিয়া দাও। ভগবানের ইচ্ছায় যাহা আছে, তাহাই হউক, তুমি শুধু তাঁহার

ইচ্ছাকে নিজের জীবনের প্রতি অঙ্গে সফল করিবার জন্য আজ্ঞাবহ যন্ত্রটী হইয়া থাক। ভগবানের আদেশবাণী তোমার কাছে কতবার কত রূপ ধরিয়া আসিবে, তাহার ইয়ত্তা করিবার ক্ষমতা কার আছে ?—সব রূপে সেই সর্ব্বরূপের সেবা করিবার জন্য উন্মুখ আগ্রহে অপেক্ষা কর,—দেখিবে দুর্গম গহন পথ সুগম সুন্দর হইবে, হিংস্র জন্তুগুলিও পোষাপাখীর মত তোমার ইচ্ছার অনুযায়ী বুলি আওড়াইবে। ভগবানের ইচ্ছাই যেদিন তোমার ইচ্ছা হইবে, তোমার ইচ্ছাও সেদিন ভগবানের ইচ্ছা হইবে। ভগবানের আসন যখন তোমার হৃদয় জুড়িয়া রহিবে, ভগবান সেদিন তাঁর শরণাগত ভক্তের আসনটী নিজের হৃদয়ের মাঝখানে করিয়া দিবেন।

বাহির ভিতর সকলই দেখিবে ভগবানের ইচ্ছায় পরিচালিত হইতেছে। ইহসংসারের বাহির বশীভূত হইতেছে, ইহসংসারের ভিতরও বশীভূত হইতেছে। চিত্তবৃত্তিগুলিও আপনিই নোয়াইয়া আসিবে,—তার জন্য ভয় নাই।

মনে রাখিও, আমার স্নেহের মা তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সহায়। বাহির ভিতর দমন করিয়া তুমি যেদিন সর্ব্বদমন হইবে, সেদিন আমার সিংহবাহিনী মা তোমার সকল শক্তির উৎস। তোমার পক্ষে দুর্ব্বলতার কারণ মনে করিয়া ক্ষণেকের তরেও তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধা বা ঘৃণা আনয়ন করিও না। তুমি নিজে

যতদিন দুর্ব্বল ছিলে বা রহিবে, ততদিন জগতের সকল শক্তি-কেন্দ্রকে তুমি অবহেলে তোমার অধঃপতনের কারণ বলিয়া মনে করিতে পার ; কিন্তু প্রকৃতই নারী নরকের দ্বার নহেন। নরকের দ্বার মানুষের নিজের অসংযম, নিজের ব্যভিচার-পরায়ণতা, নিজের নীচগামিনী প্রবৃত্তি। জল নিম্নগামী বলিয়াই সে নীচে গড়াইয়া পড়ে, মাটীর দোষ কি ? মাটী মা-টী বলিয়াই কখনও উচ্চ, কখনও নীচ, কখনও সুন্দর শ্যামলা, কখনও ঊষার-রুদ্রা, কখনও স্নেহময়ী, কখনও শাসনহুঙ্কারিণী। মা বলিয়াই তাঁর বিচিত্র রূপ ; যাহারা মাকে চিনিবে না, তাহারা ভুল বুঝিবে বলিয়া মায়ের কি দোষ ?

তবে, এ কথাও ঠিক, মা-ই ছেলেকে নিজের মত করিয়া গড়িতে পারেন, অপরে পারে না। সংসারের পঙ্কিল দৃষ্টিতে যাঁকে মানুষ নিজের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী বলিয়া মনে করে, যাঁকে ভোগ-বিলাসের সামগ্রী বলিয়া ভাবে, ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তিদায়ক অপরাপর জড় বস্তুর সমান জানে, তাঁর ভিতরে বিশ্বমায়ের বিশ্বময়ী মূর্ত্তি সম্পুটিত রহিয়াছে। সেই বিশ্বমূর্ত্তির অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে কামের কলহ থামিয়া যাইবে, লালসার রসনা স্তব্ধ হইবে, ভোগ-তৃষ্ণা নির্ব্বাপিত হইবে। তাই তোমাকে আজ ভগবানের আদেশ জানিয়া তোমার সহধর্ম্মিণীর মধ্যে অপ্রকটিত মাতৃরূপ প্রকটিত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এই প্রয়াস তোমাকে

তোমারও যথার্থ রূপ দেখাইবে, তোমার সহধর্ম্মিণীরও যথার্থ রূপ দেখাইবে। তুমি যেমন তোমার সহধর্ম্মিণীরও আধ্যাত্মিক প্রস্ফুটনে সহায় হইবে, তেমনি তিনিও দেখিও, তোমার প্রস্ফুটনে সহায় হইবেন। তিনি তোমার ধর্ম্ম-কর্ম্মের সঙ্গিনী, জীবন-সংগ্রামের রণরঙ্গিনী সখী, কিন্তু অঙ্গভাগিনী নহেন। ভগবান যেখানে জাগিয়াছেন, মানুষের নশ্বর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সেখানে হরকোপে অনঙ্গ-ভস্মের ন্যায় ছাই হইয়া উড়িয়া যায়। তুমি অথবা তোমার দেহ যেন তোমার সহধর্ম্মিণীর দেহকে না চাহে। দেহের সম্বন্ধ, সম্বন্ধ নহে ; দেহের সুখ, সুখ নহে ; দেহের তৃপ্তি, তৃপ্তি নহে। উহা বিচ্ছেদ, উহা অতৃপ্তি। নিত্য-সত্য শাশ্বত বস্তু হইতে উহা বিচ্ছেদ আনিয়া দেয়, নিরন্তর মিথ্যা সংস্কারের মোহপাশবদ্ধতায় উহা দুঃখ দান করে, আমরা রাজরাজেশ্বর-সন্তান হইয়াও উহারই কারণে নিজেদিগকে অধমের অধম, কাঙ্গালের কাঙ্গাল ভাবিয়া কল্পিত অভাবের দংশন-জ্বালায় কাঁদিয়া মরি।

হে শিব! জগতের কল্যাণ তোমার মধ্য দিয়া জাগুক। হে সুন্দর! তোমাকে যেন অপলক আঁখি দিয়া বিশ্বজগৎ চাহিয়া দেখে,—স্নেহে, পবিত্রতায়, পূর্ণতায় তোমার রূপ যেন উছলিয়া উঠে। ইতি—

তোমারই আপনার জন।

চতুর্থ পত্র

পরমপ্রেমাস্পদ—

তোমার জীবন-গঠনের সাথে সাথেই আমার স্নেহভাজিনী মায়ের জীবনও গঠিত হইয়া উঠিবে। সুতরাং তুমি সর্ব্বপ্রযত্নে তোমার আত্মজীবন গঠনে দৃঢ়ব্রত হও। তোমার মনোবৃত্তি সমূহের ক্রম-বিকাশ ও পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তোমার প্রত্যেকটী বাক্য শক্তিমত্তায় ভরপুর হইয়া উঠিবে এবং স্নেহের মা তখন তোমার বাক্যগুলিকে একরূপ নিজের অজ্ঞাতসারেই প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করিবেন। পরকে গঠন করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় নিজেকে গঠন করা। সুগঠিত মানবের এক বাক্য শত অগঠিতের মধ্যে গঠনের এবং সংস্কারের প্লাবন আনিয়া দেয়; অগঠিতের শত প্রয়াসও (বাক্য ত' নহেই) কোনও কাজে আসে না। সুতরাং মাকে যদি গড়িতে চাও, তবে সকল প্রকার প্রয়াসের সহায় লইয়া নিজেকে গঠন কর।

তোমার জীবনের মধ্যে গঠনের উপাদান আছে। ধ্বংসের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইতেও তোমার গঠনী শক্তি বিলুপ্ত হয় নাই। যাহা আজ ক্ষুদ্র-পরিসর বলিয়া প্রতীত হইয়াছে, তাহাই যত্ন-চেষ্টার ফলে বিশালায়তন হইবে। আমি যেমন গোটা পাঁচেক ব্রাহ্মী লতা হইতেই অল্প কয়দিনেই হাজারেরও অনেক বেশী লতা করিয়াছি, তোমার অন্তরের দুই চারিটী

উপাদান দিয়া ভগবান তেমনই শত সহস্র উপাদান করিয়া লইবেন। ভগবানে বিশ্বাস রাখিও, নামে শ্রদ্ধা রাখিও, প্রাণে সারল্য বজায় রাখিও, দেখিবে, যাঁহারা বিশ্ববিজয়ী কর্ম্মের কেতন উড়াইয়া যান, তুমি তাঁহাদের অপেক্ষা হীনবল নহ ,............ তোমার ক্ষণ-চঞ্চল মনেও সাগরের গাম্ভীর্য্য আসিবেই, তোমার হতাশ দুর্বল প্রাণেও উৎফুল্ল শক্তি জাগ্রত হইবেই।

* * *

তোমার প্রাণে ক্রমশঃই নিত্য নব মহান্ ভাব জাগ্রত হইতে থাকিবে। সেই ভাবগুলি হইতে স্নেহের মা-কে তুমি কখনও বঞ্চিত রাখিও না। যখন তোমার মনে সেবার মহিমা জাগ্রত হইবে, তখন তুমি মা-কে আমার, সেই কথাগুলি জানাইবে। যখন ভগবানের প্রতি অনুরক্তির ভাব প্রবল হইবে, তখন তুমি সেই ভাবটীও তাঁহাকে দিবে। তোমার সকল মহতী চিন্তা, সকল মহৎ সঙ্কল্প, সকল মহৎ কাজ, প্রত্যেকটীতে তাঁহাকে সাথে সাথে রাখিতে হইবে। তাঁহাকে অংশ না দিয়া আজ এমন কি ভগবানকে পাইবারও তোমার অধিকার নাই। আজ তুমি ভুলিয়া যাও, চিরতরে বিস্মৃত হও যে, পুরুষের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য নারীর সৃষ্টি। মন হইতে এই সমাজনাশী, বিশ্বনাশী, সর্ব্ব-নাশী সংস্কার মুছিয়া ফেল যে, নারী পুরুষের দাসী মাত্র, নারী পুরুষের উপভোগ-সামগ্রী মাত্র, নারী সন্তান প্রসবের যন্ত্র মাত্র। মন হইতে সকল কাম, সকল অশান্ত আকাঙ্ক্ষা, সকল আকুল কামনা, সকল গোপন লোলুপতা দূর করিয়া দাও ; আমি

তোমাকে রুদ্রতেজা অপূর্ব্ব কল্যাণ-কর্ম্মী দেখিতে চাহি, আর স্নেহাস্পদা মা-কে আমি ততোধিক মহিমময়ী মূর্ত্তিতে দেখিতে চাহি।

মানুষ ছোট হইবার জন্য নয়। ছোট হইবার জন্য হইলে সে মানুষ হইয়া না জন্মাইয়া পিপীলিকা হইয়াই জন্মাইত। ছোট হইবার জন্য হইলে সে হিংস্র সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি শ্বাপদের অত্যাচারে এই জগৎ হইতে এতদিনে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত। তোমার চিহ্ন জগৎ হইতে মুছিয়া যায় নাই বলিয়াই আমি চাহি, যেন কখনও না যায়। আমি জানি, নিজেকে যদি কামের কাছে আর বিলাইয়া না দাও, মনের মাঝে যদি তুমি আর লালসার দাস হইয়া না থাক, তবে তুমি সমগ্র উচ্ছৃঙ্খল মনোবৃত্তির উপরে নিজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেই।

রুদ্রাক্ষ ছিঁড়িয়াছে ত' কি হইয়াছে? মালাটী সাক্ষীর নিকটেই ছিঁড়িয়াছে ত'? বেশ কথা। তোমার কর্ম্মের সকল সাক্ষী ছুটিয়া যাক। কিসের সাক্ষী? তোমার জীবনের এই নবীন সাধন যেন সাক্ষীর মুখ চাহিয়া না থাকে। তোমার জীবন দান যেন অপরের প্রশংসমান আঁখির খোঁজ না নেয়। কে তোমার মহান্ ত্যাগ দেখিল, আর কেই বা দেখিল না, তাহা যেন তোমার বিচারের বিষয় কখনই না হয়। ভগবানকে চাওয়ার মত চাহিলে সাক্ষী ছাড়াই তুমি সর্ব্বদা-সাক্ষাৎকরণীয় সামগ্রী হইয়া থাকিবে। তুমি নিষ্কাম কর্ম্মী হও, তুমি নিঃস্বার্থ কর্ম্মী হও,—দশের, দেশের, জগতের দুঃখ দূর কর, রুদ্রাক্ষ ছিঁড়িয়াছে

ছিঁড়ুক। তোমার অক্ষিদীপ্তি যেন রুদ্রের দীপ্তিকে অনায়সে অতিক্রম করিয়া যায়।

ভগবান যে পথে চালাইবেন, সে পথে চলিতেই যেন পার, ইহাই প্রার্থনীয়। তোমার এই কথাটুকু পড়িয়া আনন্দে আমার বুকটা যেন ফুলিয়া উঠিয়াছে। তোমার এই এক কথাতেই আমার সকল স্নেহ যেন সার্থক হইয়া গিয়াছে। বাছারে, এই কথাটাই চিরকাল মনে রাখিও, তোমার পথ ভগবান করিয়া দিবেন। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহাকে কল্যাণ বলিয়া মনে করি, আমাদের ক্ষীণ দৃষ্টিতে যাহাকে ভাল বলিয়াই দেখি, ভগবানের কাছে সব সময় তাহা সেইরূপ হয় না। তাই, তাঁরই বিচারের উপর নির্ভর করিয়া আমাদিগকে চলিতে হইবে।

লক্ষ্য এক, কিন্তু কোন্ কোন্ উপায় অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, তাহা অনির্দ্দিষ্ট। জগতে যত সদুপায় আছে, সব তোমাকে একে একে পরীক্ষা করিতে হইবে। ভগবানই তোমার সহায়; তুমি বৃথা চিন্তা, বৃথা মনস্তাপ, বৃথা হিংসাদ্বেষে যেন কখনও বিজড়িত হইয়া তোমার পরম সহায় ভগবানকে ভুলিয়া যাইও না। তোমার উপরে সমালোচনার কশাঘাত পড়িতে পারে, তুমি বিচলিত হইও না, প্রতিবাদ করিও না।

* * *

আশীর্ব্বাদক—

তোমার আপনার জন

পঞ্চম পত্র

পরমপ্রেমাস্পদ —

* * * আজ অবশ্যই তুমি টের পাইতেছ না, তোমার ভিতরে সুপ্ত শক্তিগুলির যথার্থ স্বরূপ কি ? কিন্তু ভগবানের নামকে অটুট নিষ্ঠায় আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিলে একদিন সেগুলি জাগিবে এবং সেদিন বুঝিবে তোমার যথার্থ কাজ কি ?

আপ্‌নে মন্‌মে পুছ্‌লে বান্দা
ক্যা তুম্হারে নাম হ্যায়,
ক্যা তুম্হারে কাম হ্যায়,
ক্যা তুম্হারে ধাম হ্যায় ।

* * * যার যতটুকু উৎসাহ ও আনুকূল্য দিবার আছে, সে সেইটুকুই দিয়া প্রয়াণ করিবে, ইহা বিধাতার নির্দ্দিষ্ট বিধান কিন্তু তার মনুষ্যত্বের বিচার তুমি করিতে যাইও না বাছা। পরের দোষ দর্শনে নিজের মধ্যে দোষ সঞ্চিত হয়। কাহারও উপর বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ-বুদ্ধি রাখিও না,—তাহাতে তোমার উপরে সকলের বিদ্বেষ পতিত হইবে। নিজের মনকে সর্ববিধ নিন্দনীয় এবং ঘৃণ্য বৃত্তি হইতে মুক্ত রাখিয়া চল,—তোমার অনন্ত কল্যাণ হইবে।

* * * তুমি যাহাকে কারেন্সি অফিসের অচল টাকা ভাবিয়া আসিয়াছ, অবশ্যই দেখিতে পাইবে, তিনি অচল নহেন

তাঁহার তেজ, উদ্দীপনা ও উদ্যমাভিমুখিনী প্রেরণা তোমার জীবনে নবযুগ আনিবে। তোমার জীবনের এবং যৌবনের অনেক অসম্পূর্ণতাকে একমাত্র তিনিই নিজের মহাশক্তিবলে দূর করিয়া পূর্ণ পবিত্রতায় এবং মহান মহিমায় তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন। তাঁহার যে শক্তি কত, তাহা তুমি জান না। এই মহাশক্তি সহধর্ম্মিণীরূপে তোমার যথার্থ সেবা করিবেন এবং তোমার ছোট বড় সব ক্ষতগুলি শান্তির প্রলেপ দিয়া স্নিগ্ধ করিবেন। তোমার সকল তাপ ইনি শীতল—স্নেহ-পরশে হরণ করিবেন।

সহধর্ম্মিণীর শ্রেষ্ঠমূর্ত্তি মাতৃমূর্ত্তি। মায়ের স্নেহ, মায়ের সেবা, মায়ের হিতৈষণা, মায়ের পবিত্রতা, ইহা দিয়াই তোমার সহধর্ম্মিণী নিজেকে জগৎসমাজে বরেণ্যা করিবেন। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা এই যে, তিনি তোমার জীবনকে পূর্ণ করিবার সহায়তা দিবেন।

কিন্তু তোমারও বিরাট কর্ত্তব্য ইহার প্রতি আছে। ইঁহার দেবীত্ববিকাশের সকল চেষ্টা তোমাকেই করিতে হইবে। তুমি নিজে দেবতার মত পবিত্র হইয়া তোমার সহধর্ম্মিণীকে দেবী-প্রতিমারূপে গড়িয়া তোল, জগৎসংসার যেন তোমাদের যুগল-সাধনার চরণস্পর্শের অধিকারী হইবার জন্য কাড়াকাড়ি করে, আমি ইহাই চাই। তোমরা সকলের প্রতিপালক হও, এবং একে অন্যের প্রতিপালক হও। তুমি তোমার সহধর্ম্মিণীকে

ভগবানের নাম দিয়া প্রতিপালন কর, তিনি তোমাকে তাঁহার মাতৃময়ী পবিত্রতা দিয়া প্রতিপালন করুন। দেহের সম্বন্ধ, কামের সংস্পর্শ, রক্তমাংসের আকাঙ্ক্ষা চিরতরে বিলুপ্ত হউক।

আশীর্ব্বাদক

তোমার আপনার জন

ষষ্ঠ পত্র

স্নেহভাজন—

* * * তোমার জীবনের মধ্য দিয়া জগতের কল্যাণ প্রসূত হইবে,………এবং তোমার ত্যাগপবিত্র, উৎসর্গশুদ্ধ জীবন একমাত্র জগতের অসীম মঙ্গলকে আহ্বান করিবে। তাই তোমার প্রতিপাদক্ষেপে দৃঢ় একাগ্রতা ও অটুট সঙ্কল্পশীলতার প্রয়োজন।… জাগতিক সুখের কল্পনা ছাড়িয়া দিয়া জগন্মঙ্গল অনুষ্ঠানে নিজেকে, নিজের সহধর্ম্মিণীকে, নিজের কন্যাকে সর্ব্বতোভাবে উৎসর্গ করিয়া দাও। ইহাতেই জীবনের পরিতৃপ্তি পাইবে, ইহাতেই মনে প্রাণে আনন্দ উথলিয়া উঠিবে। ক্ষুদ্র সুখের আশায় নিজের বৃহত্তর সুখকে ভুলিয়া যাইও না।

তোমার সহধর্ম্মিণী তোমার ধর্ম্মকর্ম্মের সঙ্গিনী, তোমার জীবনব্যাপী ত্যাগসাধনার সহকারিণী, তোমার উৎসর্গ প্রেরণায় অদম্য উৎসাহ ও উল্লাস সঞ্চারিণী হ্লাদিনী আদ্যাশক্তি। তাঁহার সহায়তা ব্যতীত বা তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া তুমি পদমাত্র

অগ্রসর হইতে পার না। তাঁহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা তোমার পক্ষে মিথ্যা, নিরর্থক ও স্বপ্নসঞ্চরণের ন্যায় হাস্যাস্পদ। স্বার্থের আলয় ছাড়িয়া আসিবার দিন একেবারে অগস্ত্য যাত্রা করিয়া রওনা হইবেন, সেদিন যদি এক হস্তে ধর্ম্মপত্নীর হস্ত, অপর হস্তে কন্যার হস্ত ধরিয়া বাহির না হও, তবে উহা তোমার পক্ষে গৌরব নহে, অগৌরব। তোমারই সজাগ কর্ম্মশীলতার অভাবে তোমার সহধর্ম্মিণী নিঘোর নিদ্রা যাইতেছেন, তুমি নিজের সহস্র কর্ত্তব্যে উপেক্ষা করিয়া করিয়া আজও তাঁহাকে অঘোরে অচেতন থাকিতে দিতেছ। জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি তোমারই দোষে অবমানিতা হইয়া ধূলিশয়নে অবলুণ্ঠিতা। দনুজদলনী, মহিষমর্দ্দিনী, সঙ্কটতারিণী, দুঃখদৈন্যবারিণী, শঙ্কা-বিনাশিনী মা আমার অবমানাহতা হইয়া নিজেকে বিস্মৃত হইয়া আজ কামের কুক্কুরের সঙ্গকেই জীবনের চিরচরিতার্থতা মনে করিতেছেন! এই মাকে যদি একবার জাগাইয়া তুলিতে পার, তবেই বুঝিবে, অবলা হইয়াও সকল সবলতার উৎসস্বরূপা তিনি কেমন করিয়া হইলেন। জগতের দুঃখ কোলাহল যাঁর কটাক্ষ-কৃপাণে ছিন্নশির হইবে, তাঁকে আজ জাগিতে দাও, জাগাইবার জন্য প্রাণপণে ডাক। এই মা যদি একবার জাগেন, তবেই আমাদের জীবনের সকল অবসাদ ঘুচিবে, সকল অপ্রসাদ টুটিবে, সকল অসন্তোষ মুছিবে, সকল অপূর্ণতা ধূলায় লুটিবে। নতুবা তোমার সাধন-ভজন, পূজা-আরাধনা সব অঙ্গহীন হইবে।

নাকের আগায় যে কামায়নের চশমা পড়িয়া জগৎটাকে দেখিয়া আসিতেছিলে, তাহা এখনি নামাও। নতুবা নিশ্চয় উহা তোমার দুই কাণ কাটিয়া তারপরে আপনি নামিবে। সংসারের কামাবর্ত্তে পড়িয়া অনেকেই লেজকাটা শিয়াল হইয়াছে, তাহারা তোমাকে দলে রাখিতেই চাহিবে, ঘৃতমাখনের মর্দ্দনে যে কাটা লেজ আবার নূতন করিয়া গজাইতে পারে, সেই সব বাহাদুরী-বুদ্ধিতে মজগুল করিতে চেষ্টা করিবে কিন্তু তোমাকে জানিতে হইবে, তোমাকে বুঝিতে হইবে, অন্তরের অন্তরে উপলব্ধি করিতে হইবে,—প্রণষ্ট যৌবন ফিরিয়া আসে না, উপেক্ষিত সুযোগ প্রত্যাগমন করে না।

—"For men may come and men may go,
But I go on for ever."—

হাসির ফোয়ারায় বিষ ছড়ান হইয়াছে, আজ ব্রহ্মচর্য্যের অমৃত পান করিয়া সে বিষকে সংহার করিতে হইবে, তারপর আত্মজীবন জগৎকল্যাণে দান করিবে। আর সন্তানসন্ততির প্রয়োজন নাই। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" তোমার পক্ষে মিথ্যা হউক, তোমার একমাত্র কল্যাণীয়া কন্যাই তোমার কল্যাণ, তোমার সহধর্ম্মিণীর কল্যাণ, তোমার আপনার জনের কল্যাণ, তোমার বিশ্বজগতের কলাণ।

চিত্তসংযমে বা আত্মজয়ে নিজেকে অক্ষম মনে করিও না। মানুষের অসাধ্য কিছু নাই, কিছু থাকিতে পারে না, এ জগতে

কোন কার্য্য কখনও মানুষের-মত-মানুষের কাছে অসাধ্য থাকিবে না। যাহারা পরপদলেহী ভীরু, কাপুরুষ, তাহারাই অদৃষ্টের দোহাই দিয়া, কর্ম্মফলের বক্তৃতা ঝাড়িয়া অলস হইয়া ঘরের কোণে আশ্রয় লয়। প্রকৃত মানুষ নির্ভীক, নিঃশঙ্ক, আত্ম-বিশ্বাসে অটুট, কর্ম্মপ্রতিষ্ঠায় অবিচল-নিষ্ঠ। নিজেকে তুমি দুর্ব্বল মনে করিয়া ভয় পাইও না, নিজেকে তুমি অক্ষম ভাবিয়া বিষণ্ণ হইও না। বিধাতৃবিহিত শক্তিপুঞ্জকে আপন জীবনে অস্বীকার করিয়া আমরা কেবল নিজেদিগকে কর্ম্ম-কীর্ত্তিহীন এবং দীনই করি, তাহা নহে, আমরা যে পরমেশ্বরের প্রতি অকৃতজ্ঞ, তাহাই প্রমাণিত করি। নিজেদিগকে অকৃতী-অধম, অযোগ্য-অক্ষম ভাবিয়া আমরা বিশ্বস্রষ্টার অপমান করি আর মানুষ যখন আত্মবিশ্বাসে জাগিয়া উঠিয়া চিরসঞ্চিত কলঙ্করাশি সমূলে উৎখাত করিয়া গৌরবের মন্দির-চূড়া গড়ে, আমরা নিজেতে বিশ্বাস হারাইয়া তখন চির-শয়নের অকীর্ত্তিগুহা খুঁড়িয়া সমাধি রচনা করিয়াছি।

জীবন অকূল সিন্ধু, অনন্ত বিস্তার,
তরঙ্গে তরঙ্গে তার গর্জ্জন-ঝঙ্কার।

আজ আমাদিগকে গর্জ্জনের ঝঙ্কার শুনিতে হইবে : বীণার ঝঙ্কার চাহি না, ঝড়ের ঝঞ্ঝনা চাই, বজ্রের গর্জ্জন—কর্ম্মের দম্ভোলি-নির্ঘোষ চাই, ফোয়ারার তরতর ঝরঝর বারিবিন্দু আজ

সুখ দিবে না, কর্ম্মের মহাপ্রলয়-প্লাবন আনিতে হইবে,—আজ তুমি আত্মস্থ হও, আত্মপ্রতিষ্ঠ হও, আত্মজয়ী হও।

আশীর্ব্বাদক

তোমার আপনার জন।

সপ্তম পত্র

২৫শে চৈত্র

১৩২৯।

প্রিয়........,

নিজেকে যে তুমি হতভাগা বলিয়া গালি দিয়াছ, ইহা আমি সহিতে পারিলাম না। * * তোমাদের হতভাগ্যতা দূর করিবার জন্য আমি আমার একখানা একখানা করিয়া সবগুলি বুকের পাঁজর ভাঙ্গিয়া চূরিয়া গুঁড়া করিয়া দিব। তোমাদের সকল দুঃখের দিন ঘুচাইবার জন্য আমি আমার প্রতি বিন্দু শোণিত ঢালিব। আমার পরমায়ুর প্রত্যেকটী নিঃশ্বাস আমি তোমাদের কল্যাণের আহ্বানে অবহেলে উৎসর্গ করিব। তুমি আর কখনও নিজেকে "হতভাগা" বলিয়া গালি দিও না। নিজেকে ছোট ভাবিয়া, নিজের শক্তিতে দুর্ব্বলতার আরোপ করিয়া, আমাকে আর কখনও ব্যথিত করিও না। সিংহশিশু নিজেকে শৃগাল বলিয়া ভাবিলে আমি বড় ব্যথা পাই। গজরাজ নিজেকে

শূকর বলিয়া মনে করিলে আমার অন্তর-বাহির বেদনায় জরজর হইয়া উঠে।

ক্ষণিকের নহে, সুচির-শান্তি তোমার আসিতেছে; নির্ভুল সাহস তোমার ভিতরে সঞ্চারিত হইতেছে। তোমার বর্ত্তমান অস্বস্থ আত্মার মধ্য দিয়া আত্মস্থ চৈতন্যের প্রথম ঊষাপ্রকাশ দেখা যাইতেছে। * * *

চঞ্চলতাই মনের স্বভাব, সে তাহার আপন প্রকৃতির অনুসরণ করিবেই, তুমি খুশী হও কিম্বা বেজার হও, তাহা দেখিবার বা ভাবিয়া বুঝিয়া লইবার তাহার আগ্রহ বা অবসর আদৌ নাই। তুমি মনের উপর রাগ করিয়া নিজের ঘরের ভাত বেশী করিয়া খাইতে পার বা আপন গৃহে অগ্নি সংযোগও করিতে পার, তাহাতে মনের কিছু আসিবে যাইবে না। তুমি তাহাকে পাজী বলিলেই অথবা কথার পুঁজি ভাঙ্গিয়া তাহার আন্তশ্রাদ্ধ সমাপন করিলেও, সে তোমার নির্দ্দেশ মানিবে না,—যতক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার মধ্যে বিশ্বাসের শক্তি না জাগিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে তোমাকে দেখিলেই দাঁত খিঁচাইবে, মুখ ভ্যাংচাইবে, চোখ ঠারিবে। আর যেই তাহার গণ্ডদেশে তোমার সমর্থ হস্তের বিরাশী সিক্কা স্নেহ পড়িতে আরম্ভ করিবে, তখনই সে তাহার পাজী স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া গাজী বা ধর্ম্মযোদ্ধা হইয়া বসিবে এবং জীবনের ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে তোমাকে নিরত সাহায্য ও সহায়তা দান করিবে।

মনকে শাসনে রাখিবার শক্তি হইল আত্মবিশ্বাস। ইংরেজ রাজা বিদ্রোহী প্রজা শাসনে রাখেন কামান বন্দুকের জোরে, নিত্যানন্দ প্রভু ভগবদ্বিদ্বেষীকে শাসনে রাখেন প্রেমের জোরে, আর তুমি বিদ্রোহী মনকে শাসনে রাখিবে একমাত্র আত্মবিশ্বাসের জোরে। তোমাকে মনে প্রাণে জানিতে হইবে যে, তুমি অনন্ত শক্তিধরের সন্তান, তুমি তাঁরই অসীম ক্ষমতার উত্তরাধিকারী, সুতরাং তোমার প্রয়াস কখনও ব্যর্থ হইতে পারে না। তুমি যখন ইচ্ছা করিবে, বিন্ধ্যগিরি বা হিমাচল মাথা নত করিয়া তোমার আদেশ মানিবে ; তুমি যখন আদেশ করিবে, সূর্য্য-চন্দ্র কক্ষভ্রষ্ট হইতে বাধ্য হইবে। তোমার ইচ্ছার প্রাচীরে ঠেকিয়া সকল অসংযম খান্‌খান্ হইয়া পড়িবে। এই দৃঢ় বিশ্বাস অন্তরে পোষণ কর, নিশ্চয়ই তুমি মনোজিৎ হইতে পারিবে। মন বেটা যদি পাজী হইয়া থাকে, তবে তোমার ঔদাস্য অধিকতর পাজী। নিজের শক্তিতে আস্থা স্থাপন বিষয়ে উদাস বা শিথিল-প্রযত্ন না হইয়া কৃতসঙ্কল্প হও। তোমাতে আত্মবিশ্বাস আসুক এবং তাহা ক্রমশঃ বিবর্দ্ধমান হউক,—নিয়ত এই প্রার্থনা শ্রীভগবানের চরণে প্রত্যহ বার বার করিতে থাক। অকপট প্রার্থনা জীবনের মধ্যে যথার্থ সত্যকে জাগ্রত করে, প্রকৃত কল্যাণকে প্রতিষ্ঠা করে,— এই কথা নিমেষের তরেও ভুলিও না।

আমার সব ছেলেই আমার কাছে সমান, বড় ছোটর বিচার আমি করি না। তোমরা আমার সব বুক জুড়ান ধন। আমার

বুক জুড়িয়া থাকিবে,—তোমাদের সকলের জন্য আমার যথা-সর্ব্বস্ব সমভাবে সমর্পিত আছে। * * * কোনও পত্রই চিন্তা করিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া লিখিবার আমার সময় নাই; ঝোঁকের বশে যখন যাহা মনে হয় লিখি। তাই তোমার বুঝিতে কষ্ট হয়। * * তোমার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল চাই।

আশীর্ব্বাদক

তোমার আপনার জন

অষ্টম পত্র

২৯শে চৈত্র,

১৩২৯

পরমপ্রেমাস্পদেষু,—

* * * তোমার প্রথম প্রশ্নের বিশেষ কোনও উত্তর দিবার আছে কিনা, জানি না। কারণ, মানুষ নিজের অন্তরেই অনুক্ষণ অনুভব করিয়া থাকে, তার কোনও কার্য্য, বাক্য বা চিন্তা যথার্থ মানুষের যোগ্য হইয়াছে কিনা। সারা ভুবনে আমি ভোজবাজী দেখাইয়া প্রশংসা অর্জ্জন করিতে পারি, কিন্তু শতকণ্ঠের প্রশংসা-গুঞ্জনের মধ্যেও আমার নিজের মনকে ফাঁকি দিয়া কোথায় যাইব? যদি তোমার চিত্তে বা চরিত্রে কোথাও কোনও অলক্ষ্য কোণে একটিমাত্র অতি ক্ষুদ্র দুর্ব্বলতা স্থান পাইয়া থাকে, স্তাবকের অন্ধ চক্ষু বা সমালোচকের শ্যেন-দৃষ্টি তাহা না দেখিতে

পারে, কিন্তু মন তাহা জানিবে এবং তুমি ভালই বাস আর মন্দই বাস, নিতান্ত নির্লজ্জভাবে সে তাহা তোমার কাছে পাড়াকুন্দুলে কোট্‌নার মত গাহিয়া বেড়াইবে। মানুষের মুখ দুই কণা চিনি বা দুই চাক্‌তি রূপা দিয়া বন্ধ করা চলে, কিন্তু মনের মুখ তুমি একযোগে হিমালয়, আল্‌প্‌স ও আন্দিজ পর্ব্বতমালার সমস্ত পাথর দিয়া চাপিয়া ধরিলেও বন্ধ করিতে পারিবে না। * * বেদনার স্থানে চাপ দিলে বেদনা বাড়ে বই কমে না। মনুষ্যত্বের অভাবের বেদনা মানুষ নিজেই বোঝে, খুব ভাল করিয়াই বোঝে,—এত ভাল করিয়া বোঝে যে, মনুষ্যত্ব কি ও কেমন, তাহা তাহাকে বলিয়া বুঝাইতে হয় না। মনুষ্যত্ব যে কি জিনিষ, কত তাহার গরিমা, আর কেমন তাহার মহিমা, তাহা সে ভাল করিয়া বোঝে বলিয়াই, যেখানেই মানবোচিত পৌরুষ, বলবীর্য্য, তেজস্বিতা, ত্যাগ-পরায়ণতা প্রভৃতি সে লক্ষ্য করে, সেখানেই সে নিজের শত দুর্ব্বলতাকে ক্ষুব্ধচিত্তে ধিক্কার দেয়, আর যথার্থ মানুষের গৌরব-গাথা রাজপুতানার চারণের মত সম্ভ্রমসিক্ত শ্রদ্ধায় মনে মনেও গান করে। কামাসক্ত লম্পটও কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগীকে ভক্তি না করিয়া পারে কৈ? ক্রোধান্ধ অসুরও মনে মনে দেবস্বভাব সংযমীর ধৈর্য্য ও তিতিক্ষার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে কৈ?

মানুষ কাহাকে বলে, তাহা আমরা জানি, কিন্তু এত জানি যে, বলিতে গিয়া ভাষার দৈন্যে মূক হইয়া যাই। যে অসীম

পূর্ণতা,—সর্ব্বপ্রকার বিরুদ্ধ মনোবৃত্তি ও শক্তিপুঞ্জের যে সর্ব্ব-সুন্দর সামঞ্জস্য—মানুষের "মনুষ্যত্ব", তাহাকে সংজ্ঞার গণ্ডীর মধ্যে আনিয়াও আনিতে পারি না। কিন্তু ইহা কি আমি-তুমি, রামা-শ্যামা, যদু-মধু প্রত্যেকেই জানি না যে, আগ্রার তাজমহল গঠনে যদি চারি কোটি টাকাও ব্যয় হইয়া থাকে, মোগল-বাদশাহের ময়ুর-সিংহাসন নির্ম্মাণে যদি দশ কোটিরও উপর রৌপ্য মুদ্রা প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা হইলেও, একমাত্র "মনুষ্যত্ব" লক্ষ কোটি তাজমহল বা ময়ূর-সিংহাসনের বিনিময়েও কিনিতে পাওয়া যায় না? আমেরিকার বিপ্লবে যখন জেনারেল রীড্‌কে দেড় লক্ষ টাকা উৎকোচ প্রদানের প্রস্তাব করা হইয়াছিল, তখন তিনি ঘৃণাভরে উহা প্রত্যাখ্যান করিয়া ব্রিটিশ কমিশনারকে বলিয়াছিলেন,—"মহাশয়, আমি দরিদ্র, অত্যন্ত দরিদ্র, কিন্তু আমাকে কিনিবার মত ঐশ্বর্য্য তোমাদের রাজার নাই।" এর চেয়ে বড় কথা,—বীরশ্রেষ্ঠ শিখগুরু যখন নিজের মাথা দিয়া গর্ব্বিত মোগল সম্রাটকে শিখাইলেন,—"শির্ দিয়া, সার্ না দিয়া।" * এইগুলি কি আমরা বুঝিই না? ইঁহারা যে

---

* শিখগুরু তেগবাহাদুর সুপ্রসিদ্ধ গুরু গোবিন্দ সিংহের পিতা। তেগবাহাদুর তদীয় প্রতিদ্বন্দ্বী রামরায়ের চক্রান্তে দিল্লীশ্বর আওরঙ্গজেবের বিরাগভাজন হইলেন। যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হইয়া তেগবাহাদুর দিল্লীতে আনীত হইলে পর ধর্ম্মদ্বেষী আওরঙ্গজেব মৃত্যুদণ্ডের আদেশ করিলেন এবং অবজ্ঞা ও উপহাস সহকারে তাঁহাকে শিখধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন

ইতিহাসের বুকে স্মৃতির তীর্থ রচিয়া গিয়াছেন, সেখানে কি আমরা অবলুণ্ঠিতমস্তক হই না ?

'মানুষ' যে আমরা নই, একথা প্রকৃতই,---প্রাচীন গ্রীসে জ্ঞানী ডায়োজিনিস্ একদিন দিবা দ্বিপ্রহরের সময় বাতি জ্বালিয়া এথেন্স নগরীর দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়াছিলেন, খাঁটি একটি মানুষ খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য। কিন্তু বিফল প্রয়াস। আমাদেরও দেশে কেহ কেহ দিনের বেলায় বাতি হাতে করিয়া

করিতে বলিলেন। তেগবাহাদুর ইহাতে গম্ভীরভাবে কহেন, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের উপাসনাই মনুষ্যের একমাত্র কর্ত্তব্য। তথাপি একটি বিষয় প্রদর্শিত হইতেছে। আমি একখণ্ড কাগজে কয়েকটী কথা লিখিয়া গলায় বাঁধিয়া রাখিতেছি, গলদেশের যে অংশে এই লিখিত কাগজ থাকিবে, ঘাতকের অসি যেন সে স্থান স্পর্শ না করে।" তেগবাহাদুর ইহা কহিয়া, লিখিত কাগজ গলায় বাঁধিয়া, ঘাতকের দিকে মাথা বাড়াইয়া দিলেন। নিমেষমধ্যে উত্তোলিত অসি তাঁহার স্কন্ধে নিপতিত হইল, নিমেষমধ্যে তেজস্বী শিখগুরুর দেহবিচ্ছিন্ন মস্তক মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। এই অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ এবং এই অপূর্ব্ব নির্ভীকতা দেখিয়া দিল্লীর ধর্ম্মান্ধ সম্রাট বিস্মিত হইলেন। ইহার পর যখন সেই লিখিত কাগজ খোলা হইল, তখন তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। আওরঙ্গজেব সবিস্ময়ে,....ভীতিবিহ্বলচিত্তে দেখিলেন,....ঐ কাগজে লেখা রহিয়াছে....

"শির দিয়া সার্ না দিয়া।"

"মাথা দিলাম, কিন্তু ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব দিলাম না।"

আর্য্যকীর্ত্তি....

বাহির হইয়াছেন, কিন্তু মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, হিংসা, দ্বেষের অন্ধকারের মধ্যে সারাদিন হাতড়াইয়াও, মানুষ খুঁজিয়া পাইতেছেন না।

আজ আমাদিগকে মানুষ হইতে হইলে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে এক একটী করিয়া ভাগবত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে। সকল নেতৃত্ব, সকল অহংবোধ, সকল কর্ত্তৃত্বাভিমান ভগবানের হাতে ছাড়িয়া দিয়া আমাদের দেহকে তাঁহার পবিত্র মন্দির, মনকে তাঁহার পায়ের নির্ম্মাল্য এবং আত্মাকে তাঁহার পাদপীঠ করিতে হইবে। তিনি আসিয়া যেমন করিয়া খুশী, আমার অন্তর-বৃন্দাবনে লীলা-খেলা করুন, যেমন করিয়া খুশী আমার জীবন-যমুনায় বাঁশীর রবে উজান বহাইয়া দিন, আমি তার কিছুই জানি না। —"ওগো ভগবান, তুমি আমার ভিতরে এস, আর আমাকে তোমার ভিতরে নাও; আমার কর্ম্ম তোমার কর্ম্ম হউক; তোমার কর্ম্ম আমার কর্ম্ম হউক; আমাকে তুমি তোমার কর, তোমাকে আমি আমার করি।"—ইহাই মনুষ্যত্ব ফিরিয়া পাইবার মূলমন্ত্র। ইতি—

তোমার আপনার জন

নবম পত্র

পরমপ্রিয়—, ১০ই বৈশাখ, ১৩৩০।

* * * যোগ্য জনের মধ্যে যথাযোগ্য সাধনা বিকশিত হইয়া উঠুক......তোমার মধ্যে তোমার কল্যাণ, তোমার দেশ—

বাসীর কল্যাণ এবং বিশ্বের কল্যাণ নির্বিবাদে জাগ্রত হউক ....। * * *

নিশ্চিত রূপে জানিও, যাহা মানুষের প্রথম কর্ত্তব্য, তাহাই তাহার শেষ কর্ত্তব্য। প্রথম কর্ত্তব্য, দ্বিতীয় কর্ত্তব্য, তৃতীয় কর্ত্তব্য প্রভৃতি ক্রমিক বিভাগ কর্ত্তব্যের জগতে নাই। যাহা "মানুষের" কর্ত্তব্য, একমাত্র তাহাই তাঁহার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বা শেষ কর্ত্তব্য। গরু হইতে ছাগল যেমন পৃথক, সাপ হইতে বাঘ যেমন পৃথক্, শূকর হইতে গণ্ডার যেমন পৃথক্, তোমার জীবনের কর্ত্তব্যের মধ্যে তেমন একটা ভেদ-বিভাগ নাই। তোমার সমগ্র জীবনটাই একটা মহান্ কর্ত্তব্য, এই একটি মাত্র কর্ত্তব্যই করণীয়, এই একটিমাত্র লক্ষ্যই অনুসরণীয়। হাজার নহে,—এক ; মানুষের ভগবান্ এক, মানুষের কর্ত্তব্যও এক। তাই তাহার অটুট একনিষ্ঠা, অবিচল ঐককেন্দ্রিকতা চাই ; তাই বিক্ষিপ্ততায় কর্ত্তব্য অসমাপিত থাকিয়া যায়, ব্রত উদ্‌যাপনের ত্রুটী রহিয়া যায়।

একটি জীবনে কয়টা ব্রত পালন করিব ? হাসির ব্রত, খেলার ব্রত, ভাবনার ব্রত,—ভিন্ন ভিন্ন করিয়া কয়টা ব্রতকে সাধন-জীবনে নিজস্ব করা চলিবে ? যেখানে "এক"-ই সর্ব্বদা অবহেলিত হইতেছেন, "বহু" সেখানে আদর-আপ্যায়নের কোন ভরসা রাখিতে পারে ?

আমাদের হাসি, আমাদের কান্না, আমাদের হরষ, আমাদের বিষাদ, আমাদের সুখ, আমাদের দুঃখ প্রভৃতি সকল বিরুদ্ধ ভাব

ও অবস্থা লইয়া যে সামঞ্জস্য অখণ্ড জীবন,—সে অখণ্ড জীবনে আমাদের একটিমাত্র সাধনা আছে, উহা মনুষ্যত্বের সাধনা। জীবনের সকল ছোট বড় খুঁটিনাটিটুকু পর্যন্ত লইয়া উহা পূর্ণতার পূর্ণাঙ্গ সাধনা। এই সাধনায় বিশ্বজগতের সকল কৃচ্ছ্র সংযুক্ত হইয়াছে এবং সকল কল্যাণ ইহার অনুসরণ করিয়াছে। সুখ-দুঃখের পুঁজি লইয়া বিশ্বদেবতার পূজার নৈবেদ্য সাজাইতে গিয়া অবিমিশ্র আনন্দে অর্চনা সমাপন করিয়াছে।

শক্ত কথা বলিতেছি কি? তোমার কি বুঝিতে কষ্ট হইবে? কিন্তু বাছা, আমার যে মনের জমি জুড়িয়া কেবল শক্ত শক্ত মাটীর ঢেলা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাদের আমি নরম করিব কেমন করিয়া? মানুষ নিজে যে বড় শক্ত চীজ্; তার কথা ভাবিতে গেলে মনের নমনীয় বৃত্তিসমূহের প্রত্যেকটি মাংসপেশী যেন বিদ্যুতের চঞ্চলতায় শক্ত হইয়া উঠে। ভয়-ভাবনা ভুলিয়া তখন তাহারা রুদ্র-ভৈরবের তাণ্ডব নাচিতে চায়,—দুর্বলের মত শয্যাশায়ী থাকিয়া সাগু-বার্লির শ্রাদ্ধ করিয়াই "পৌরুষ প্রকাশ করিয়াছি", মনে করে না।

এই জন্যই ত', মনুষ্যত্বের সাধনা প্রকৃতই বিঘ্ন-বহুল। আবার বিঘ্ন-বহুল বলিয়াই যথার্থ সাধনা ভীতিরহিত; মানুষ হইতে যে চাহিয়াছে,—একমাত্র আমিই বলিব তাহা নহে,—সমগ্র জগতের ইতিহাসই বলিবে, ভয়ভীতি শঙ্কাসঙ্কোচকে সে পিপ্ড়ার জাঙ্গালের মত পায়ে দলিয়া মারিয়াছে। কারণ, তখন সে

নির্দ্দিষ্টরূপে জানিয়াছে,—সাধনের প্রেরণা যখন তাহার বিদ্যুন্ময়ী, মৃত্যু যদি তখন তাহাকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিয়াই ফেলে, তাহা হইলে মৃত্যুই গৌরবান্বিত হইবে, তাহার গৌরব বাড়িবে না। যে-মৃত্যু চিরদিন অলসের ঘৃতাম্লস্পৃষ্ট দেহে ক্ষয়-রূপে প্রবেশ করিয়া প্রাণটুকু হাতের মুঠায় অনায়াসে লইয়া বাহিরিয়া আসিয়াছে, যে-মৃত্যু ভয়ভীতের কম্পমান গ্রীবাদেশে উদয়াস্তকাল নির্ম্মম, নিষ্করুণ কুঠারাঘাত করিতেই অভ্যস্ত, সেই মৃত্যু নির্ভীক সাধকের কাছে আসিতেই অর্দ্ধচন্দ্র পাইয়া বিষ বয়ানে ফিরিয়া যায়। যাঁহাদের সমর্থ হস্তের কঠোর স্পর্শ মৃত্যুকে বারবার ব্যাকুল-বিচলিত করিয়াছে, তাঁহারা যে দয় করিয়া মৃত্যুর নাম রাখিবার ফন্দীতে কায়া পরিত্যাগ করিয় থাকেন, ইহাতে মৃত্যুরই পরম সৌভাগ্য।

ষোল-আনা মানুষ যে কি, তাহা আমি কেমন করিয় বুঝাইব? কিন্তু এইটুকু ভুল না করিয়াই বলিতে পারি,—মানুষের মত মানুষ সর্ব্বসময়ে সর্ব্বাবস্থায় নির্ভীক। আমি তোমাকে নির্ভীক হইতে অনুরোধ করিতেছি।

তোমারই আপনার জন

দশম পত্র

স্নেহাস্পদ—,

* * * শিবাজীকে রামদাস স্বামী সর্ব্বত্র গায়ের জো চালাইয়া মানুষ করিয়াছিলেন। * * * শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনে

সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে হত্যাসঙ্কুল যুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি জানিতেন, যুদ্ধই এখানে মনুষ্যত্ব, দয়া এখানে কাপুরুষত্ব। অনেক চিন্তার পর যে পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে, আজ ক্ষণিক অবসাদে তাহা ছাড়িয়া দিলে চলিবে না।

* * * তুমি জগতের এবং জগৎ তোমার। তোমাদ্বারাই ভগবানের কাজ হইবে, কিন্তু যে-তুমি আত্মসুখপরায়ণ, যে-তুমি স্বার্থ-লিপ্সু, যে-তুমি ভোগলালস, সে-ই তোমাদ্বারা নহে। যে-তুমি পরার্থে উৎসর্গীকৃত-সর্ব্বস্ব, যে-তুমি স্বার্থ-বোধবিহীন, যে-তুমি ত্যাগশুদ্ধ, সেই-তোমাদ্বারা ভগবানের কাজ হইবে। তুমি যখন ভগবানের হইবে, তুমি যখন আর তোমার পূর্ব্বসংস্কারের রহিবে না, তোমার অসংযত চিত্তবৃত্তির রহিবে না, তোমার ভবিষ্য-কল্যাণ-বোধ-বর্জ্জিত ক্ষণিক মোহের রহিবে না, তখন তোমাদ্বারা ভগবানের কাজ হইবে। জগতের সকল সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কাছে যখন একেবারে অগস্ত্য-বিদায় লইয়া বাহির হইয়া পড়িবে, নিজের পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব যখন ষোল-আনা সত্য এবং ধর্ম্মের উপর ভিত্তিবান্ হইবে, যখন তোমার সাধুতা, সত্যবাদিতা ও ন্যায়-নিষ্ঠতা সোণার বিনিময়ে কেনা যাইবে না, তখন তোমাদ্বারা ভগবানের কাজ হইবে। যখন তুমি বুঝিবে, মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধ সত্য এবং সরল, বিসমার্ক-ম্যাকিয়াভেলীর বৈষম্যবুদ্ধির স্থান এখানে নাই, বলদর্পিত নাদির শাহের উৎপীড়নের অবসর এখানে নাই, আভিজাত্য গর্ব্বিত ধনিসন্তানের

তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যপূর্ণ অবজ্ঞার অধিকার এখানে নাই, তখন তোমা দ্বারা ভগবানের কাজ হইবে। প্রেম যখন তোমার সমগ্র হৃদয়-মন জুড়িয়া বসিবে, নিজেকে সকলের দৃষ্টিতে ছোট রাখিয়াও যখন আর সকলকে ঈর্ষ্যাহীন-চিত্তে বড় করিতে চাহিবে, তাহা-দিগকে বড় করিতে গিয়া যখন নিজে সঙ্গে সঙ্গে বড় হইয়া গেলেও অহমিকা আসিয়া তোমার ঘাড়ে চাপিয়া বসিবে না, জগৎকে ভালবাসিবে বলিয়াই যখন নিজেকে ভালবাসিবে এবং নিজেকে ভালবাসিতে যাইয়া যখন জগতের প্রতি অণুপরমাণুকে ভালবাসিবে, সেইদিন তোমাদ্বারা ভগবানের কাজ হইবে।

হতাশ হইও না, ভগবানের কাজ তোমাদ্বারাই হইবে। আজ তুমি যেমন করিয়াই আত্মশক্তিকে মুচিঘুচি করিয়া রাখিয়া থাক না কেন, শতদল পদ্মের ন্যায় ইহা পূর্ণবিকশিত হইবে এবং ভগবানের পাদপদ্মে অঞ্জলিকৃত হইবে। সুদৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া সমুচ্চ আদর্শ লইয়া ভগবানের কাজের যোগ্য হইবার জন্য অবিচল-চিত্তে নির্ভয় এবং নির্ভর সাধন আরম্ভ কর। ক্ষুদ্রবৃহৎ যে সকল সুযোগ ভগবান্ তোমার হাতের কাছে আনিয়া জড় করিতেছেন, নির্বিচারিত চিত্তে, নির্দ্বৈধ বুদ্ধিতে, নিঃশঙ্ক সাহসে তাহা নিজস্ব কর। একটি একটি করিয়া কাজে আনিতে আনিতে দেখিবে শত সহস্র সুযোগ আসিয়া উৎসব বাড়ীর নিমন্ত্রিতের মত ঠিক্ পাতা পড়িবার আগখানেই হাজির হইবে। যাহারা ব্যবহার করিতে জানে বা ব্যবহার করিতে চাহে,

তাহাদের জন্য সারা জগৎ-জোড়া সুযোগ থরে থরে সাজান রহিয়াছে ; যাহারা সুযোগে অলস থাকিবে, সুবিধায় উদাসী রহিবে, তাহারাই শুধু সুযোগ খুঁজিয়া বেড়ায়। লটারীর টিকেট অন্ধ অক্ষমের সম্বল, আর প্রকৃত কর্ম্মীর পক্ষে জীবনের উপস্থিত দুর্য্যোগসমূহই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুযোগ। কাঁধের উপরে গামোছা রাখিয়া, কাণের উপরে কলম রাখিয়া অনেকে গামোছা ও কলম খুঁজিয়া হয়রান্ হয়। বগলে ছাতা রাখিয়া অনেকে সারাপথ বৃষ্টিতে ভিজিয়া বাড়ীতে ফিরে, তারপর ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া ভিজা জামা-কাপড় ছাড়িবার সময়ে তার লক্ষ্য পড়ে যে, ছাতা তার সাথেই ছিল! তেমনি আমরা নিকটতম সুযোগের জন্য দূরতম দেশে চলিয়া যাই, নিজেরই ভিতরে অনন্ত শক্তিপুঞ্জ নিহিত থাকা সত্ত্বেও পরের মুখপানে অনুগ্রহের কাঙ্গাল হইয়া তাকাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—

তোমার আপনার জন।

একাদশ পত্র

স্নেহাস্পদেষু,

* * * এবং অনধিকার-চর্চ্চারত ব্যক্তির সংসর্গ যে সুখাবহ নহে, তাহা বুঝিলাম। কিন্তু যেখানে বিশ্বজোড়া অনুযোগ এবং অভিযোগের বিরুদ্ধে তোমাকে মানুষ বলিয়া পরিচয় দিতে

হইবে, সেখানে এই সব ভাবিয়া বা আলোচনা করিয়া নিজের তেজস্বিতা, কর্ম্মমুখতা এবং প্রয়াসশীলতা চাপা দিয়া রাখিও না। তোমার শুইবার বসিবার বিন্দুমাত্র স্থান না থাকিলেও তোমার আত্মশক্তি এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার অপেক্ষা বৃহত্তর বান্ধব যখন কেহ নাই বা থাকিতে পারে না, তখন শূদ্রসুলভ দুর্ব্বলতায় অসামঞ্জস্য বা অপূর্ণতার দোহাই দিয়া নিজের ভবিষ্য নির্ম্মাণের সৌধভিত্তি ছাড়িয়া যাইতে চাহিও না। জগতে যাহারা বিধাতার দেওয়া রাজটীকা পরিয়া আসিয়াছে, তাহারা বিধাতৃদত্ত অনুগ্রহ-পুঞ্জের অপপ্রয়োগ করিয়া পরের উপরে কখনই প্রভুত্ববিস্তার করিতে পারে না, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা পুঞ্জীভূত দাসত্বের বিপুল বোঝা নিয়ত স্কন্ধে বহন করিয়া বেড়ায়। তাহাদের ক্ষণিক সুখোন্নত গর্ব্বগরিমায় নিজেকে ছোট বা অসহায় ভাবিয়া ইহ-পারলৌকিক সর্ব্ববিধ প্রতিষ্ঠার মূলে পরশুরামের মাতৃঘাতী কুঠার নিক্ষেপ করিও না। কোনই ছল-চাতুরী, ফন্দী-ফিকির বা ষড়যন্ত্রের ভয় রাখিও না ; জীবনের উন্মুক্ত সমরাঙ্গনে যাঁহারা নির্ভীকহৃদয় বীর, তাঁহারাই নিত্যজয়ী ; জয়োল্লাস তাঁহাদেরই, জয়োৎসব তাঁহাদেরই। প্রতিপাদবিক্ষেপে নিজের ছায়া দেখিয়া যাহারা ভীত-চকিত ত্রস্ত হইয়া বারংবার হতাশ করুণ–দৃষ্টিতে পিছন ফিরিয়া চাহে, তাহাদের জন্য জগতের কোনও কল্যাণ কোনও সম্পদ নাই। নিরাপদ থাকিতে পারিবে, কি না পারিবে সেই শঙ্কা মন হইতে মুছিয়া ফেল, মনের জমি হইতে সাপ

কোদাল মাটী তুলিয়া ফেলিয়া দাও। ছার মানুষের ছার বুদ্ধি-বৃত্তির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ধী-শক্তি তোমাকে আমাকে প্রাকৃতিক বিপ্লবতরঙ্গে নর্ত্তনান্দোলিত করিয়া চালাইয়াছেন। সেই শ্রেষ্ঠতম খেলোয়াড়ের কাছে এসব মানুষ তুচ্ছ, নগণ্য। ঐশ্বর্য্যের হৈমপালঙ্ক এবং তদানুষঙ্গী চিত্তবিকারী বিলাস-বিভ্রম একবার স্বপ্নে দেখিয়াও যাহাদের তৃপ্তি, তাহারা এই জগতের ক্ষণিক খেলোয়াড়ের চালবাজি দেখিয়া ভয় খাইতে পারে, কিন্তু যাহারা কেবল স্বপ্নেই নহে, একেবারে জাগ্রত জীবনে কঠোর দারিদ্র্যের কঠিনতম নিষ্পেষণকে সত্য করিয়া চাহিয়াছে, তাহারা এসব ছায়াবাজী দেখিয়া হতবুদ্ধি হয় না। তোমার জীবনকে আমি জগৎ-কল্যাণে মহাকৃচ্ছ্রসিদ্ধ দেখিতে চাই, তোমার মধ্যে ঐশ্বর্য্যের উপেক্ষা এবং দারিদ্র্যের বরণ নির্ভুলরূপে প্রত্যক্ষ করিতে চাই,—তোমাকে আমি মশক-দংশনে কাতর হইতে দিতে পারি না। ইতি—

তোমার আপনার জন।

দ্বাদশ পত্র

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০

পরমপ্রীতিভাজনেষু,—

* * * ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা অবশ্যই তোমাকে করিতে হইবে। শতবার বিফলপ্রযত্ন হইলেও পুনরায় নবীন

উৎসাহে ভীমবলে বলীয়ান্ হইয়া অগ্রসর হইতে হইবে মনুষ্যত্বের সাধনা পরিহার করিয়া এতদিন আমরা একমাত্র পশুত্বের পূজা করিয়া আসিয়াছি, জীবনীয় অমৃত পায়ে ঠেলিয়া কালকূটে সমাদর করিয়াছি। আজ আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইলে অবশ্যই শতকোটি বাধার প্রাচীর প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির অবার্থ আঘাতে চূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। হতাশ হইও না, অণুমাত্র দুর্ব্বলতাকে হৃদয়ে স্থান দান করিও না; জীবন্ত উল্লাসে দৃঢ়তর পণ করিয়া মানুষের মত অগ্রসর হও। হতাশা তোমার জন্য নহে, দুর্ব্বলতায় হাবুডুবু খাইয়া মরিবার জন্যই তুমি ধরাতলে অবতীর্ণ হও নাই। প্রভাত-সূর্য্যের ক্রমবিবর্দ্ধমান কিরণের মত তোমার অন্তর্নিহিত আত্মশক্তি, তোমার অদম্য তেজস্বিতা, তোমার সর্ব্ব-বিঘ্ন অগ্রাহ্যকারী পৌরুষ তোমাকে তোমাতে প্রতিষ্ঠিত করিবে। তোমার আপনার মহিমায় জাগ্রত হইয়া তোমার স্বকীয় গৌরবে জীবন্ত রহিয়া তুমি যে কত শত মরণোন্মুখের শুষ্ককণ্ঠে প্রাণের ও প্রীতির অমিয় প্রবাহ ঢালিয়া দিবে, সে কথা আজ ভুলিও না। জগতের অনন্ত কোটি ক্ষুধিত আত্মার ক্ষুধা-নির্ব্বাপণের জন্য তোমাকে তোমার দেহ-মাংস খণ্ড করিয়া কাটিয়া কাটিয়া বাঁটিয়া দিতে হইবে, তাহাদের যুগান্তর-সঞ্জাত তৃষ্ণা মিটাইবার জন্য তোমার শরীরের শিরাগুলি কাটিয়া তাহাদিগকে রুধির দিতে হইবে। এই কথা মনে করিয়া ত্যাগের এই আনন্দে উল্লসিত হইয়া, আত্মোৎসর্গের প্রেরণা

উচ্ছ্বসিত হইয়া নিজেকে দৃঢ়ব্রত রাখিতে সঙ্কল্পবান্ হও। নিশ্চয় ব্রহ্মচর্য্য ষোল আনা বজায় থাকিবে।

এতদিন শুনিয়াছি, নিজেরই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, নিজেরই ভোগ-সামর্থ্য, নিজেরই স্বাস্থ্য-সম্পদ অক্ষত রাখিবার জন্য আমাদিগকে ব্রহ্মচারী হইতে হইবে। কিন্তু ভগবান আজ জানাইতেছেন, নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, নিজের সৌভাগ্য-সম্পদ সমস্ত মুহূর্ত্তে পদাহত করিয়া জগতের সকলের জন্য দ্বিধাহীন চিত্তে, কুণ্ঠাহীন প্রাণে নির্ব্বিচারে আত্মাহুতি দিবার জন্যই ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। কুকুর-বিড়ালের আত্মসুখ, শকুনী-গৃধিনীর আত্মতৃপ্তি আজ যেন কোনও ব্রহ্মচারী না চাহে,—আজ যেন সে প্রতি অঙ্গে জগতের প্রতিজনের দাস হইয়া, প্রতিজনের সেবক হইয়া, ক্ষুধার অন্ন হইয়া, তৃষ্ণার জল হইয়া, রোগের ঔষধ হইয়া, শোকের সান্ত্বনা হইয়া, পীড়নের অভয় হইয়া, ব্যথার আনন্দ হইয়া, বর্ষার গৃহছাদ হইয়া, রৌদ্রতাপের ছত্র হইয়া, বৃদ্ধের যষ্টি হইয়া, অন্ধের নয়ন হইয়া, মূকের বাক্য হইয়া, বধিরের শ্রবণ হইয়া,—যে যাহা চাহে, যার যাহা প্রয়োজন, তার তাহাই হইয়া নিজের পরিপুষ্ট ব্রহ্মচর্য্যকে সার্থক করে। যে ব্রহ্মচারী শুধু বীর্য্যক্ষরণ বন্ধ করিয়া দিয়াই 'কেল্লা ফতে' করিল বলিয়া মনে করিতেছে, আমি তাহাকে চাই না। ব্রহ্মচর্য্যকে অবলম্বন করিয়াছে বলিয়াই যাহারা অক্ষম পঙ্গু সমাজের স্কন্ধে দশমণী বোঝা হইয়া চাপিয়া বসিল, আমি তাহাদেরও চাহি না। কেন

না, 'বীর্য্যধারণং ব্রহ্মচর্য্যম্' ব্রহ্মচর্য্যের একটা সঙ্কীর্ণ সংজ্ঞা মাত্র, এই সঙ্কীর্ণ সংজ্ঞার শক্ত ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য তাহার বহুমুখ বাহু পল্লব বিস্তারিত করিয়া দিয়াছে সমগ্র বিশ্বে। সেই দিনকে তোমরা তোমাদের অপরাজেয় পরাক্রমের প্রভাবে শীঘ্র আনয়ন কর, যেদিন আমি ব্রহ্মচারীর প্রসন্ন মুখমণ্ডলের জ্যোতির্ম্ময় মহিমার জ্যোৎস্নায় তরঙ্গে তরঙ্গে কেবল ব্যথিতের জন্য সমবেদনা, পীড়িতের জন্য সহানুভূতি দেখিব, পতিতের জন্য পাবন-মন্ত্র নিরন্তর শুনিব। সেই দিনটীকে তোমরা আনয়ন কর, যেদিনকার ব্রহ্মচারী কাষায় বসনের অন্তরালে নিজ শক্তি-সামর্থ্য, তেজোবীর্য্য এবং জাতীয়তা-বোধকে লুকাইয়া রাখিয়া অম্লান চিত্তে চক্ষের সমক্ষে ক্ষুধার্ত্তের ক্রন্দন, উৎপীড়িতের আর্ত্তনাদ সহ্য করিতে পারিবে না। শৃঙ্খলাবদ্ধ পরাধীনের লৌহ-কারার যন্ত্রণা যাহার শৃঙ্খলহীন হৃদয় মধ্যে সহানুভূতির ঝঞ্ঝা সৃষ্টি করে, সেই বজ্রবীর্য্য, উগ্রতেজা ব্রহ্মচারীদের রৌদ্ররাগরঞ্জিত কর্ম্মমুখর যুগকে তোমরা আনয়ন কর। ভাগবতী লীলার অপূর্ব্ব বিকাশ আজ আমি ত্যাগের আয়োজনের মধ্যে দেখিতে চাই,—ভোগোন্মত্ত, আত্মপরায়ণ, নিজ-সুখসর্ব্বস্ব ও মুখমাত্রসম্বল ব্রহ্মচারীরা আমার দৃষ্টির সম্মুখ হইতে অপসারিত হউক।

জগৎ কাঁদিতেছে,—জগৎ যে আমাদিগকে মানুষ করিবার জন্যই কাঁদিতেছে। আমি-তুমি অমানুষ রহিয়াছি, আমি-তুমি স্বার্থের সাগরে হাবুডুবু খাইয়া অমূল্য জীবনকে ব্যর্থ করিয়া

দিতেছি, এই জন্যই জগৎ কাঁদে। মুন্সীয়ানা করিয়া আমরা বলিতে পারি জগৎ তার নিজের দুঃখে কাঁদিয়া মরিতেছে, আর আমরাই তাহার দুঃখ দূর করিব। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নয়। মন একটু সুস্থির হইলে, অন্তর্দৃষ্টি একটু খুলিলে স্পষ্ট দেখিতে পাই,—আমারই অন্ধত্ব দেখিয়া চক্ষুষ্মান্ জগৎ আমার দুঃখে সমদুঃখী হইয়া আমাকে সাবধানবাণী শুনাইতেছে,—"ওরে অন্ধ! চক্ষু মেলিয়া চাহিবার চেষ্টা কর, চেষ্টা করিতে করিতে চ'খের পাতার জোড়া খুলিয়া যাইবে, নতুবা হায়! হায়! তুই যে চিরতরে অন্ধ রহিবি!" জগৎ আমাকে পশুত্বের প্রচণ্ড সীমায় উপনীত দেখিয়া ডাকিয়া বলিতেছে,...."হারে মূর্খ! এখনও ফিরিয়া আয়, নিজেকেই জগতের কেন্দ্র না ভাবিয়া প্রকৃত কেন্দ্রে আনিয়া নিজেকে স্থাপিত কর্। নতুবা পড়িয়া মরিবি, প্রাণে মরিবি!" আমার আত্ম-পরায়ণতার হীন অবনতি লক্ষ্য করিয়া জগৎ আমাকে তার দিকে ডাকিয়া বলিতেছে,—"ওরে হতভাগা! সকলকে নিজের মধ্যে ভোগ না করিতে চাহিয়া সকলকে নিজের মধ্যে ভুক্ত কর্।" নতুবা ছোট হইতে হইতে এত ছোট হইয়া পড়িবি যে, তখন আর শত আকুল ক্রন্দনেও কিছু হইবে না। বিলাইয়া দে, নিজেকে ছড়াইয়া দে,—যে শাখা-প্রশাখা ছড়াইয়া দেয়, সে-ই বনস্পতি; —যে ডাল-পালা সঙ্কুচিত করিয়া রাখে, ছড়াইতে শিখে নাই, সে আগাছা!"

আমাদের জীবন পরের জন্য মরণে। পরের কাজে মরিবার জন্যই জীবন পাইয়াছি, পরের জন্য মরিতে পারিলেই এই সীমা-বদ্ধ জীবনকে অসীমরূপে পাইব। হে ব্রহ্মচারিণ্‌! আজ এই কথা মনে রাখিয়া কর্ম্মের পথে নির্ভীক চিত্তে চল ; ভগবান্‌ তোমার সহায়।

আশীর্ব্বাদক

তোমার আপনার জন

ত্রয়োদশ পত্র

৪ঠা জৈষ্ঠ, ১৩৩০

নিত্যকল্যাণভাজনেষু :—

জীবনকে যাহারা সত্য বলিয়া জানিয়াছে, তাহারা ইহাকে ক্রমবিবর্দ্ধমান বলিয়াও বুঝিয়াছে। শীতের প্রখর পীড়নে পত্র-পল্লববিহীন হইয়াও বসন্তের মলয়-হিল্লোল গায়ে লাগিবামাত্র পাদপশ্রেণী নবাঙ্কুর মেলিয়া দেয়। যাহা রিক্ত হইয়াছে, গ্রীষ্মের প্রখর তাপে যে সরোবরের সকল সলিল শুকাইয়া গিয়াছে, ভরাবর্ষার অবিরাম ধারায় তাহা ডুবু-ডুবু হইয়া উঠে। ব্রহ্মচর্য্যহীনতা, সংযমের অভাব অথবা সাধনায় নিষ্ঠাহীনতা যে মানবতাকে শুষ্ক এবং খর্ব্ব করিয়া রাখিয়াছে, বক্র এবং বিশ্রী করিয়া তুলিয়াছে, ইহাদেরই অব্যভিচারিণী তপস্যায় তাহা সরস এবং সরল, সুন্দর এবং সুদীর্ঘ হইবে। যাহাকে অপমান

করিয়া কপালে আগুন ধরিয়া গিয়াছে, তাহাকে সম্মানের আবাহন দিলে চন্দনের সুশীতল স্পর্শ পুনরায় অনুভূত হইবে, তাই আর কাঁদিও না,—ব্যথিত হৃদয়ে ক্রন্দনের বন্যায় আর ব্যথা আনিও না। অনুতাপ বিসর্জ্জন দিয়া বর্ত্তমানের সকল অসুযোগ ও অসুবিধাকে অগ্রাহ্য করিয়া কেশরী-বিক্রমে ভবিষ্যতের অবিসংবাদিত গৌরবকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর। জগতে যাহারা অপ্রতিষ্ঠিত, তাহারাই শোকে-দুঃখে অতিষ্ট; যাহারা পায়ের গোড়ালি দিয়া মাটিতে শক্ত করিয়া খুঁটি গাড়িতে পারিয়াছে, তাহারা অতীতের দুঃখময়ী কথা ভাবিয়া মুহ্যমান হয় না, ভবিষ্যতের দুর্লঙ্ঘনীয় বাধা দেখিয়া টলে না, বিদ্রোহের ঘোর গর্জ্জন শুনিয়া কাঁপে না, পলে পলে তাহারা বাধা-বিঘ্নকে চরণ-তলে দলিতে থাকে, জগতের আপদ-বিপদকে অবহেলে ভূতলে সমাধিশায়িত করে।

অনন্ত কোটি বিন্দুর সমবায়ে সিন্ধুর উৎপত্তি। বিন্দু বিন্দু শুষিয়া সিন্ধু শুকাইয়া দেওয়া যায়, আবার বিন্দু বিন্দু জমাইয়া সিন্ধু ভরিয়া দেওয়া যায়। চাই শুধু একটু ধৈর্য্য। তোমাকে এক্ষণে প্রাণপাত শ্রমে শক্তি-সঞ্চয় করিতে হইবে। বিন্দু বিন্দু করিয়াই সঞ্চয় করিতে হইবে। আজ এক কথা কাল এক কণা করিয়া প্রতিদিনের সমুচ্চয়ে তোমার মধ্যবর্ত্তী অখণ্ড শক্তির উন্মেষ হইবে। অবনতির পথেও যেমন একদিনের অবনতি কখনও চক্ষে পড়ে নাই, উন্নতির পথেও একদিনের উন্নতিটুকু

ধরা পড়িবে না। তপস্যার বলে, আজ তুমি যাহা আছ, কাল তাহা থাকিবে না। কাল যাহা আছ, পরশ্ব তাহা থাকিবে না। প্রতিদিন তোমার মধ্যে অণু-পরমাণুর মতন সূক্ষ্ম শক্তি জাগ্রত হইবে এবং দিনে দিনে তাহা তোমাকে দশের হিতে, দেশের হিতে, জগদ্ধিতে সমর্থ এবং যোগ্য করিবে। সাধন করিলে সিদ্ধিলাভ হইবেই, যত্ন করিলে রত্ন মিলিবেই, প্রয়াসে রহিলে প্রতিষ্ঠা অনিবার্য্য ; কাঁদাকাটি করিয়া আর মাটি ভিজাইও না,— দৃঢ় ইচ্ছায় অনুতাপ চাপিয়া রাখিয়া কর্ম্মের ক্ষেত্রে নামিয়া পড়।

অদূর ভবিষ্যতে যে বিরাট কর্ম্ম আসিতেছে, তাহার জন্য ভাবের দিক্ দিয়া নিজেকে সর্ব্বপ্রকারে প্রস্তুত করাই তোমার প্রথম কাজ। ভগবানের আদেশ-বাণী তোমার কাছে নামিয়া আসিতেছে, তোমাকে উহা ঠিক করিয়া শুনিবার জন্য, নির্ভুল-রূপে বুঝিবার জন্য উদ্‌গ্রীব উন্মুখ থাকিতে হইবে। ভগবান্ তোমার কাছে কোন্ কঠোর আদেশ প্রেরণ করিবেন, আজ তুমি তাহা জান না। তোমাকে সেই অজ্ঞাত আদেশ পালন করিবার জন্যই উৎকণ্ঠ হইয়া দিন-যামিনী উন্নিদ্র আগ্রহে কাটাইতে হইবে। ভগবানের দাস, ভগবানের সন্তান আজ শুধু ভগবানের পানেই চাহিবে, নিজের অতীত শুভাশুভ কর্ম্ম বা কর্ম্মফলের পানে নয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
আপনার জন

চতুর্দ্দশ পত্র

প্রেমাস্পদ........,

* * * মন তোমার আদেশ মানিয়া চলে না বলিয়াই হতাশ হইয়া পড়িলে চলিবে না। তোমার ভিতরেই এমন ঐশী শক্তি রহিয়াছে, যাহা জাগ্রত হইলে পরে মনকে অনায়াসে বশীকৃত করিতে পারিবে। সেই ঐশী শক্তির জাগরণের উপায় অসংখ্য, কিন্তু সে উপায় তোমার কাছে ততদিন পর্য্যন্ত আসিবে না, যতদিন পর্য্যন্ত তুমি নিজেকে নিজে বিশ্বাস করিতে না শিখিতেছ। নিজেকে মাঝিহীন নৌকার ন্যায় অসংবদ্ধ এবং অসহায় ভাবিয়া মাঝদরিয়ায় ডুবিও না। বিশ্বাস কর যে, তোমার ভিতরেই আপদুদ্ধারিণী, সঙ্কটতারিণী, সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনী আদ্যাশক্তি বিরাজমানা। তোমারই মধ্যে সিংহাসন রচনা করিয়া তিনি রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তিতে সমাসীনা রহিয়াছেন।

এই বিশ্বাসকে পরিপুষ্ট কর। বিশ্বাসের শক্তিতেই বিশ্বাস পরিপুষ্টি লাভ করে এবং ইহাকেই বাহন করিয়া দানবদলনী দশ-ভুজা অবতীর্ণা হইবেন।

পুরুষসিংহ বা সিংহপুরুষ একই কথা। আত্মশক্তিতে বিশ্বাসই যথার্থ সিংহ। তাহারই পৃষ্ঠে পদযুগ স্থাপন করিয়া জগদ্ধাত্রী মাতা শত্রু-সংহারিণী রূপ ধরেন। কাম, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি যত কিছু অশান্তি, অরাতি ও অসংযম আমাদের

নিজস্ব ব্যক্তিত্বের পবিত্রতা কলুষিত করিতে মহিষাসুরমূর্তি ধরিয়া আসিবে, "পুরুষত্ববাহিনী" জননী তাহাদের ধ্বংস-সাধনের জন্য অবতীর্ণা হন।

"পুরুষত্ববাহিনী" কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। সে-ই পুরুষ, যে নিজের শক্তিতে বিশ্বাসবান্। তাহারই পৌরুষ আছে বলিয়া স্বীকার করি, বিপদের শত পীড়নে অবনীত হইয়াও যে মনে মনে অটুট প্রত্যয় রাখে যে, আজিকার দুর্দিন কাল থাকিবে না। শত নিষ্পেষণের মধ্যেও অন্তরের মাঝে অন্তহীন আশা জাগাইয়া রাখার নামই পৌরুষ। ইহারই অপর নাম যৌবন। —বিশ্বপালিনী জননী এই পৌরুষের পৃষ্ঠে পাদপীঠ করিয়া তবে আসেন।

তোমার ভিতরে পরাশান্তি লাভের জন্যই যদি ব্যাকুলতা জন্মিয়া থাকে, তুমি ধন্য এবং আমি দৃঢ়স্বরে বলিতেছি,—শান্তি তুমি পাইবে। কিন্তু বাছা, অপেক্ষা কর, আশায় প্রতীক্ষা কর, —গাছে ফল না পাকিলে জোর করিয়া পাড়িলে আস্বাদনের মধুরত্ব পূর্ণতঃ থাকে না; আবার সম্পূর্ণরূপে পরিপক্ক হইলে কাহারও অপেক্ষা না করিয়াই আপনা আপনি টুস্ করিয়া বোঁটা ছিঁড়িয়া পড়িয়া যায়। —তোমার ব্যাকুলতাকে পরিপক্ক হইতে দাও।

অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন অনেক আছে। অনেকের জীবনে মিথ্যা ব্যাকুলতা আসে,—অনেক জননী যেমন মিথ্যাগর্ভ ধারণ

করেন। প্রকৃত ব্যাকুলতা আসিলে তাহা কখনও নিরর্থক হইবে না, ভগবানের আশিস পাইয়া, মহাপুরুষগণের স্পর্শ লভিয়া সার্থক হইবেই। তার জন্য তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও। আজিকার ব্যাকুলতা যদি সত্যিকার ব্যাকুলতা হইয়া থাকে, তবে তুমি শান্তি লাভ করিবেই; আর যদি তাহা না হইয়া থাকে, তবে ভগবানের নাম করিয়া আশ্বাস দিতেছি, প্রকৃত ব্যাকুলতা তোমার আসিবেই।

শত প্রকারের বিক্ষিপ্তচিত্ততার মধ্য দিয়া ভগবানের আশীর্ব্বাদ আমাদের জীবনে আসে। দুঃখ ও দুর্দ্দশাই সৌভাগ্যের জনক এবং জননী। সুতরাং দুঃখ বা দুর্দ্দশা দান করিয়া ভগবান আমাদিগকে সৌভাগ্যই দান করেন।

* * * একই লক্ষণে সকল ঔষধ ব্যবস্থাপিত হয় না। বা একই ঔষধ সমস্ত লক্ষণে কার্য্যকরী হয় না। কিন্তু ভগবান সর্ব্বৌষধি, সর্ব্বরোগে তিনিই শান্তি। তোমার তাপদগ্ধচিত্ত স্নিগ্ধ করিবেন তিনিই। তোমাকে স্নেহ-কোমল শীতল ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন তিনিই। তোমার বিষাদ-খিন্ন মলিন মুখে সুখের হাসি ফুটাইবেন তিনিই। ইতি—

তোমারই

আপনার জন

পঞ্চদশ পত্র

কল্যাণবরেষু,

* * * সকলের কাছ হইতে যদি ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে থাক, তথাপি একজন আছেন, যাঁহার দুয়ার হইতে কেহ ফিরিয়া আসে না। সবাই তোমাকে দিয়াছে শুধু পসরাভরা দুঃখ, কিন্তু একজন আছেন, যিনি তোমার সকল দুঃখ দূর করিবেন।

আমরা অহমিকা রাখিয়া কাজে নামি বলিয়াই মানুষের দেওয়া বাধাবিঘ্নকে ভগবানের দেওয়া আনুকূল্যের অপেক্ষা বড় মনে করি। তাই আমরা দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়ি; ইহারই অন্তরালে ছাই-চাপা আগুনের মত সোণালী রঙ্গের সুখ-সোহাগ যে ভগবান্ আমাদের জন্য পুঞ্জ-পুঞ্জীকৃত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা আমাদের খেয়াল থাকে না।

সকলের দুয়ার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছ বলিয়া হতাশ হইবার কিছু নাই, তুমি এখন একবার ভগবানের দুয়ারে আঘাত দাও। সেই অসম্বলের সম্বল, অশরণের শরণ, অনাশ্রয়ের আশ্রয়, পরমানন্দ পুরুষের পদযুগল একবার জড়াইয়া ধর। ইহা আমার শিশু-সান্ত্বনার মুখের কথা মাত্রই নহে। পরীক্ষা করিলে অচিরে বুঝিবে।

* * * ভগবানের কাজ ভগবানই অপূর্ব্ব উপায়ে করিয়া লইবেন। ভগবানের অদৃশ্য এবং অপরিমেয় শক্তি ও সঙ্কল্পকে

আমরা আমাদের আবৃত ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝি না বলিয়া কতবার সুধার সাগরে অবগাহন করিয়াও ভুলেও একবিন্দু পান করি না। সাগরে ডুবিয়া মরিবার ভয়ে কেবল হাত-পা আছড়াই। কিন্তু যদি,নিমেষের তরেও জানিতাম, ক্ষণেকের তরেও বুঝিতাম যে, একবিন্দু সুধা উদরস্থ হইলেই আর ডুবিয়া মরিবার ভয় থাকে না, বরং ডুবিয়া থাকিয়াই চিরজীবন ও চিরযৌবনকে লাভ করিতে পারিব, তবে কি সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গময়ী আকুলতা ও হিংস্রতা দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইতাম! ভগবানের কাজ ভগবান্ করিবেন—তাঁর প্রয়োজনমত মান-অপমান, গৌরব-অগৌরব, নিন্দা-প্রশংসা, স্তুতি-গ্লানি সব তিনি আমাদের উপরে চাপাইয়া ইচ্ছানুযায়ী গড়িয়া লইবেন,—শুধু এই বিশ্বাসরূপ সুধাবিন্দু উদরস্থ হইলে আর আমাদের মৃত্যুর ভাবনা থাকিত কৈ ?

* * * ভবিষ্যতের উপর যে তুমি আস্থাবান্ হইতে পার নাই, তাহার কারণ, তুমি ভগবানের উপর আস্থাবান্ হও নাই। ভগবানের উপর আস্থা আসিলে মানুষ নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে, শুধু নিজের কেন, বিশ্বজগতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আস্থাবান্ ও নির্ভীক হয়। শতপ্রকারের প্রয়াসসৃষ্টি করিয়া নিজেকে ভগবানের পায়ে সঁপিয়া দিতে চেষ্টা করিতে থাক। চক্ষুষ্মানের কাছে "আত্মচেষ্টা" বলিয়া পৃথক একটা জিনিষ নাই। জগতের সকলের চেষ্টা একমাত্র অখণ্ড অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের চেষ্টা বলিয়া তিনি স্পষ্টই দেখিতে পান।

'স্ব'—এর অধীন যে, সেই স্বাধীন। আসল 'স্ব'-এর অধীন যে, সে হইল আসল স্বাধীন। আর নকল 'স্ব'-এর অধীন যে, সে হইল নকল স্বাধীন। যথার্থ স্বাধীনতায় খণ্ডবুদ্ধি নাই। অযথার্থ স্বাধীনতায় ভেদবুদ্ধি, বৈষম্যবোধ আছে; তাই উহাতে একজন স্বাধীন হইলে আর একজন পরাধীন হয়; একই ব্যক্তি এক দিক দিয়া স্বাধীন হইলে অপর দিক দিয়া পরাধীন হয়। সকল খণ্ডতা যাঁহার মধ্যে নিমজ্জিত রহিয়াছে এবং যিনি নিজে অখণ্ড অপরিমেয় হইয়া নিজের নামের শক্তিকেও অখণ্ড অপরিমেয় করিয়াছেন, তাঁহার উপরে আস্থাবান্ হও; তাঁহার অধীন হও; তাঁহার দাস হও।

সমগ্র জগদ্-ব্রহ্মাণ্ড যদি ভগবানের হইয়া থাকে, চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারা যদি তাঁরই হইয়া থাকে, তবে জগতের অতীত ভবিষ্যৎও তাঁরই। অতীত ভাবিয়া আকুল হওয়া যেমন তোমার সাজে না, ভবিষ্যৎ ভাবিয়া অকূলে পড়াও তোমার পক্ষে তেমনই খাটে না।

*

"যে রচিল এ ব্রহ্মাণ্ড নিজের প্রয়োজনে
সে কি, বসে আছে তোর ভরসায়
অলস হয়ে ঘরের কোণে?" (সতীশচন্দ্র)

আমরা কি করিব, না করিব, সে জল্পনার উপরে নির্ভর করিয়া ভগবান্ নাকে তেল দিয়া ঘুমান না। তুমি তোমার শক্তি সাধ্য ও বুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করিতে থাক, চেষ্টা চলিতে থাকুক,

তোমাকে চিরকালের জন্যই ভগবানের হইয়া থাকিতে হইবে। আজ যদি নিজেকে ভগবানের ভোগারতি-মন্দির বলিয়া জান, কাল তুমি জঞ্জাল-স্তূপ হইতেই পারিবে না। আজ তুমি নিজেকে ভগবানের অক্ষুণ্ণ মহিমার গৌরবান্বিত পতাকা-বাহক বলিয়া বিশ্বাস কর, কাল কিছুতেই তোমার পৃষ্ঠে নৌ-দাসের (Galley slave) দাসত্ব-চিহ্ন অঙ্কিত হইতে পারিবে না। উৎসর্গীকৃত বলির উপরে আর কাহারও স্বামিত্ব বর্তে না। একবার নিজেকে ভগবানের জন্য দিয়া দিলে আর তোমার জীবনের উপর ভোগের, বিলাসিতার, স্বার্থের স্বত্ব থাকিবে না। তোমার যদি জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পাইতে হয়, তাহা ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া লব্ধ হউক; তোমার যদি অনায়াস আরাম কখনও লাভ করিতে হয়, তবে তাহা ভগবানের কার্য্যের সৌকর্য্য বিধানার্থ সম্পাদিত হউক। তোমার প্রতি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, তোমারই জীবন রক্ষার হেতুভূত না হইয়া একমাত্র ভগবানের প্রয়োজনসাধনার্থ হউক। তোমার আহার, বিহার শ্রম ও বিশ্রাম তোমারই জীবন ধারণের জন্য না হইয়া ভগবদিচ্ছা পূরণার্থে হউক। তোমার রক্তকণাসমূহের দ্রুত স্পন্দন তোমার "আমি-আমি" বোধ বিচলিত করিয়া একমাত্র ভগবানের নাম-গান করুক; সেই স্পন্দনে স্পন্দনে নামের অমিয়-উৎস ঝরিয়া পড়িতে থাকুক, তাপদগ্ধ মরু মরুবাসী তাহা আকণ্ঠ পানে কৃতকৃতার্থ হউক।

দ্বিধা বা সংশয় সুদূরে নিক্ষেপ কর।—অথবা ভগবানেরই শুভাশিসে উহারা দূরীভূত হইয়া প্রাণের ঠাকুরকে তোমার জীবনের মধ্যে সংশয়াতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবে। তাঁর কাজের যোগ্য তিনি নিজেই আমাদিগকে করিয়া নিবেন। তার জন্য আমাদের কোনও বিষণ্ণ চিন্তার সহিত সখ্যত: সাধনের প্রয়োজন নাই। আত্মসুখ-পরায়ণতা, ভোগ-লালসা, স্বার্থলিপ্সা দূর না হইলে আমরা ভগবানের কাজে আসিতে পারিব না, কিন্তু ইহাদিগকে ভগবানই নিজের গরজে দূর করিয়া দিবেন। তুমি-আমি সাধারণ বুদ্ধিতে মনে করি, আমরাই আমাদের মনের জঞ্জাল দূর করি, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবানই তাঁর নিজ প্রয়োজনে সময়মত আসিয়া সব করিয়া দিয়া যান। যাবতীয় অযোগ্যতার কথা ভাবিয়া হতশক্তি, গতবুদ্ধি হইও না; যিনি অযোগ্যতা থাকিতে দিয়াছেন, তিনিই ইহা দূর করিবেন। আজ এখনই এক অনুপলের মধ্যে তুমি লেখাপড়া একেবারে ভুলিয়া যাইতে পার? সাঁতার ভুলিতে পার? যদি না পার, তবে লেখাপড়া বা সাঁতার শিখিবার সময় 'তুমি' উহা শিখ নাই, আর কেহ শিখিয়াছেন। তোমার নিজের সম্পত্তিই তুমি ইচ্ছা করিলে দশ মিনিটে উড়াইতে পার, কিন্তু রথচাইল্ডের সম্পত্তি তোমার ইচ্ছায় উড়িবে না। যাহা তোমার ইচ্ছায় খোয়াইতে পার না, তাহা তোমার নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে কোনও

অযোগ্যতাও তোমার নহে। যোগ্যতা যিনি দিতে পারেন, সকল অযোগ্যতাও তাঁরই দেওয়া। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

তোমার আপনার জন।

ষোড়শ পত্র

স্নেহের........,

ব্যাধির আক্রমণে নত হইয়া পড়িও না, ব্যাধি দেহধারী মাত্রেরই হয়। যে উন্নত লক্ষ্য তোমার জীবনের পথগতি নিয়মিত করিতেছে, সেই লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে দেহের ধর্ম্মকে অস্বীকার করিয়া আত্মার শক্তিতে শক্তিমান হইতে হইবে। তোমার দ্বারা যে শতকোটি ব্যাধিতের আরোগ্যের দিগ্‌দর্শন হইবে, তাহা নির্দ্ধারিত রূপে জানিয়া নিজের এই রোগ-যন্ত্রণাকে অগ্রাহ্য কর। রোগ-শোক চিরস্থায়ী নহে, অমৃতের পুত্রের পক্ষে অমৃতই চিরস্থায়ী। শাশ্বত জীবন যার জাগ্রত হইয়াছে, বিনশ্বর দেহ বিচলিত বা পরিভ্রষ্ট হইলেও সে কখনও হতাশ বা কর্ত্তব্য-পথচ্যুত হয় না। তোমাকে অচঞ্চল প্রযত্নে আত্মস্থ থাকিতে হইবে, দুঃখ-দহন, ব্যাধি-বেদন সব একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে হইবে। হে বীর, জগতের শত জন যখন শত দিক হইতে তোমাকে ডাকিতেছে, তোমার সবল হস্তের সহায়তা চাহিতেছে, আতুর আগ্রহে তোমার বাহুযুগলের নির্ভর

মাগিতেছে, সে সময়ে দেহ জীর্ণ ও রোগশীর্ণ বলিয়া কোন্ কাজে তুমি ম্রিয়মান রহিতে পার ? দেহ শয্যাশায়ী হইলেই যে তোমার চিত্তও ধুলিধূসরিত হইবে, এ কেমন কথা ? দেহের প্রার্থনাকে অগ্রাহ্য করিয়া আত্মার আহ্বানে সাড়া দাও, রোগের কাতরতা ভুলিয়া জগতের দুঃখে সহানুভূতিতে আজ তরল হইয়া গলিয়া যাও। তোমার আদর্শ তোমাকে যেমনটী চাহিতেছে, তোমার আপনার জনেরা তোমাকে যেমনটী দেখিলে কৃতার্থ হইবেন, তুমি আজ তেমনটী হও বাছা। ইতি—

আপনার জন।

সপ্তদশ পত্র

২০শে শ্রাবণ, ১৩৩০

নিত্যমঙ্গলাস্পদেষু :—

বলিবার কথা আমার অনেক আছে। এত আছে যে, কণ্ঠ বাহিয়া বাহিরিবার জন্য তাহারা বিষম ঠেলাঠেলি লাগাইয়া দিয়াছে। তাহাতে আমার বুকের মধ্যে অসহনীয় উত্তাপ ও বেদনার সৃষ্টি হইয়াছে। কারণ, আমার যে শুধু একটা বই দুইটী কণ্ঠ নাই! সব কথা বলিবার জন্য যে শত শত কণ্ঠ চাই,—যে কণ্ঠে বজ্র ও বীণা একত্রে গর্জ্জন-ঝঙ্কারে মুখরিত হইয়া উঠে, তেমন সহস্র কণ্ঠ চাই। আজ তোমাকে কোন্ কথা আমি বলিব ? চারিদিকে খোলা চোখে চাহিয়া দেখ

Collected by Mukherjee T.K.,Dhanbad

খোলা কাণ পাতিয়া শুন, সকলে আজ কি বলিতে চাহিতেছে। আজ খোলা চোখে চাহিতে পারিলে আমার মুখের কথা না শুনিয়াও তুমি আমার মরমের কথা বুঝিতে পারিতে। ঐ যে বিশীর্ণ কঙ্কাল আমারই শতকোটি ভাই-বোন, ঐ যে ক্ষুৎ-পিপাসা-পীড়িত আমারই লক্ষ কোটি আপনার জন, উহাদের মুখপানে তাকাইয়া দেখ, বুঝিবার মত দরদ থাকিলে অনায়াসে আমার কথা বুঝিবে। দিবা-অবসানে অন্ধকার যেমন স্বতঃসিদ্ধ, উহাদের মুখেও বেদনার আর্ত্তি, পীড়নের হতাশা তেমনই সুব্যক্ত। উহাদের দেখিয়া যদি তুমি উহাদের কথা বুঝিতে পার, যদি প্রাণের সমগ্রটুকু দিয়া উহাকে ধারণ করিতে পার, তবে আমি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেও আমার কথা বুঝিবে। নতুবা বক্তারের তারে তারে পৃথিবী ঢাকিয়া ফেলিলেও উহা তোমার নিকট অবোধ্যই রহিবে। দীনদুঃখীর মর্ম্মবেদনা যদি আমার কথায় তোমার হৃদয়ে জাগিয়া উঠে, অত্যাচারিতের আর্ত্তধ্বনি যদি আমার কণ্ঠে পরিস্ফুট হইয়া তোমার শ্রবণে ধ্বনিয়া উঠে, তবেই উহা প্রকৃত আমার কথা হইবে।

তুমি তোমার কাছেও আমার কথা জিজ্ঞাসা করিও। আয়নায় মুখ দেখিয়া নিজের মুখের উপরে আমার কথা পাঠ করিও। যদি আমার কথা শুনিতে চাও, তবে তোমার কথা শুনিতে চাহিও। আজ তোমরা আত্মস্থ হও, আজ তোমরা নিজের পানে তাকাও আর পরের পানে ফিরিয়া চাও, পরের

দুঃখ দূর করিতে বিপদ-সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়। তোমাদের কণ্ঠ, তোমাদের জ্বলন্ত আত্মত্যাগ যেদিন মুখর হইয়া উঠিতে শিখিবে, সেদিন আর আমি আমার শত কণ্ঠ নাই বলিয়া দুঃখ করিব না। ইতি—

তোমার আপনার জন।

অষ্টাদশ পত্র

১লা আশ্বিন, ১৩৩০

স্নেহাস্পদেষু ঃ—

শুধু মন দিয়া চাহিলে চলিবে না, প্রাণ দিয়া চাওয়া চাই। প্রাণ দিয়া চাহিলেই চাইবার মত চাওয়া হয়, সুতরাং পাইবার মত পাওয়াও হয়। মন দিয়া চাহিয়া ক্ষণভঙ্গুর স্মৃতিশেষ কল্যাণকে পাইতে পার, স্মৃতির সম্ভাব্যতা-বিহীন নিত্যপ্রত্যক্ষ অচলপ্রকাশ পরমানন্দকে লাভ করিতে পার না। তাই তোমাকে প্রাণ দিয়া চাহিতে হইবে। প্রাণ দিয়া চাহিতে পারিলে বিশ্বজগৎ তোমার সাথে ঐকতান-বদ্ধ হইয়া পরম প্রার্থনীয়কে তোমার জন্য চাহিবে।

যখন তুমি প্রাণ দিয়া চাহিবে, বিশ্বপ্রাণ তখন টলিবে। নিজেকে যতই কেন পৃথক করিয়া আজ ভাব না লক্ষ্মী, জগতের একটা তুচ্ছাতিতুচ্ছ অণুপরমাণুকেও ছাড়া তুমি নও, তোমাকে ছাড়াও উহাদের কাহারও অস্তিত্ব নাই। আর, প্রাণ অনংশ

অখণ্ড ও অব্যর্থ। তাই প্রাণের সাধনা কখনও যুক্তিতর্কে খণ্ডিত হইতে পারে না, ব্যাখ্যায় ব্যর্থ হয় না। তপস্যা সূর্য্যেরই মত স্বয়ম্প্রকাশ, তপস্যার তেজ সূর্য্য-তেজেরই ন্যায় ক্রমশঃ অভিব্যক্তি-শীল এবং মর্ম্মভেদী, যেখানে সে আলোকরূপে প্রবেশ করিতে পারে না, সেখানে সে তাপের প্রচ্ছন্নরূপ ধরিয়া আত্মবিস্তার করে। তপস্যার প্রকাশ্য শক্তির অপেক্ষা অপ্রকাশ্য প্রভাব সহস্র গুণ অধিক। তপস্যার প্রকাশ্য ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ বলিয়া বিস্তারও সীমাবদ্ধ, অপ্রকাশ্য ক্ষেত্র সকল সীমারেখার বাহিরে বলিয়া তাহা অফুরন্ত এবং কৃপাশক্তির নামান্তর। তাই মহাজনগণ বলিয়াছেন, তপঃশক্তি সসীম, কৃপাশক্তি অসীম।

প্রাণ দিয়া সাধন কৌশল-সাপেক্ষ। "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।" যুদ্ধক্ষেত্রে গুলি খাইয়া মরিলেই প্রাণ দেওয়া হয় না, আবার না মরিয়াও প্রাণ দেওয়া যায়। সে কথা ভগবানের কৃপাশক্তির অবতারণ না হইলে কেহ জানিতে পারে না, আবার আবেগ ও আকুলতার তরঙ্গ জীবন ও যৌবনের সঙ্গমস্থলের তিনকূল ছাপাইয়া উঠিলে জানিতে বড় বাকীও থাকে না।

যাহা বলিবার কথা নয়, তাহা বলিতে আরম্ভ করিয়াই নির্ব্বাক হইতে হইল। ইতি—

তোমার আপনার জন।

ঊনবিংশ পত্র

২৭শে কার্ত্তিক, ১৩৩৬

স্নেহের—,

কেবল খাইতে বসিয়াই নহে, সব সময়েই, শুধু মৌনের জন্য মৌন, বহুভাষণের শাসন ব্যতীত অপর কোনও কল্যাণের উপযোগিতা রাখে না। জিহ্বার সংযম বড় কঠিন কথা এবং অশেষ কল্যাণবাহী, একথা সত্য; কিন্তু পারে যদি, কেন তবে মানুষ এই মৌনকে বৃহত্তর জগতের বৃহত্তর কল্যাণের উপরে প্রভাবশালী করিবে না?

তোমার মৌনে তোমার প্রচ্ছন্ন শক্তির উন্মেষ হউক, যাহা অজ্ঞাতে রহিয়া তোমাকে নিরন্তর নিঃসহায় ও অনাথ করিয়া রাখিয়াছিল, মৌনের মধ্যবর্ত্তিতায় তাহা জাগ্রত হউক এবং তোমার আত্মার চরিতার্থতায় ও ক্ষুৎ-পিপাসা-পীড়িত বিশ্ববাসীর পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তিতে সমর্পিত হউক।

আত্মসুখের জন্য বা ভোগলিপ্সু দেহের জন্য যে অন্ন গ্রহণ করিতেছি, তাহা ত' এই দেহখানাকে আর অমর করিয়া দিতে পারে না! মৌন ভাবসাধনার দ্বারা আজ ক্ষুধার সহিত সত্য সুন্দরের সংযোগ সাধিত হইয়া দেহ রক্ষার সাথে সাথে বিশ্বাত্মাকে পরিতুষ্ট করুক। এই দেহ যে জগতের কল্যাণকল্পে উৎসর্গ করিতে হইবে, সুখলোভী মনোবৃত্তির প্রলোভন-মুখিনী প্রবণতা হইতে সযত্নে রক্ষা করিয়া ইহাকে যে জগন্মঙ্গল-যজ্ঞের আহুতি

স্বরূপে সমর্পণ করিতে হইবে, প্রতিগ্রাস অন্ন আমাকে তাহাই স্মরণ করাইয়া দেউক।

যথার্থ সাধকের কাছে মৌন কর্ম্মহীনতা নহে, ভবিষ্যৎ কর্ম্মের আয়োজন মাত্র; কর্ম্মবিরতি নহে, আরম্ভ মাত্র। তপশ্চার্য্যার সন্নিবিষ্ট মনঃশক্তি তখন প্রতি মরমীর মর্ম্মে আঘাত করে এবং অনুভূতির অজ্ঞাতসারে তাহাকে প্রকৃত কর্ম্মপথবর্ত্তী করে। যাহারা প্রেম থাকা সত্ত্বেও পথ চিনিতেছিল না, তাহারা তখন মৌনীর অনাহুত উপদেশ পথ বাছিয়া লয়। আর, যাহারা কল্যাণকে চাহিত না, অকল্যাণের নরককুণ্ডকেই স্বর্গসুখ ভাবিয়া অনির্দ্দেশ পতনের পথে ছুটিয়াছিল, তাহারা কুশলের অভাব অনুভব করে, হৃদয়ের গোপনতম প্রদেশে নিবিড়তম বেদনা উপলব্ধি করিয়া চমকিয়া উঠে। তোমার মৌন তেমন মৌন হউক, তাহা হইলেই উহা যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর শ্রদ্ধায় অভিসিঞ্চিত হইবে। ইতি—

তোমার আপনার জন।

বিংশ পত্র

কল্যাণীয়েষু—,

স্নেহের,—* * * সুখসেব্য সৌভাগ্য লইয়া জীবনের অমূল্য দিনগুলি কাটাইয়া দিতে পারে শুধু অলসেরা। ভগবানের কাজ গুরুভার হইয়া যাহাদের স্কন্ধের উপরে

নিপতিত হইয়াছে, তাহারা দুঃসহ দুঃখকেই ভগবানের দয়ার দান জানিয়া অকম্পিত অন্তরে দাবানলের মাঝে ঝাঁপাইয়া পড়ে। জগতে মানুষ বলিয়া যাঁহারা পরিচয় দিতে চাহেন, বক্ষে-পৃষ্ঠে কীট-পতঙ্গের পরিচয় আঁকিতে যাঁহারা কুণ্ঠায় নতশির হন, চিরকাল তাঁহারা মরণকে পদদলিত করিয়াছেন। বিলাস-ব্যসনের মায়া-মরীচিকায় না ভুলিয়া গহন পথের অসহন দুঃখকে সোণার সোহাগা বলিয়া তাঁহারা মানিয়া লইয়াছেন। মান-সম্ভ্রম, লোক-লৌকিকতা, ইষ্টানিষ্ট, নিন্দাযশ প্রভৃতিকে সমজ্ঞান করিয়া বিজয়ী সেনাদলের ন্যায় সদর্পে শলা-শূল-সমাকীর্ণ সমাজ-প্রান্তরের বক্ষের উপর দিয়া পদক্ষেপ করিয়া তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন। বিবেকের অনুশাসনকে মান্য করিতে যাইয়া প্রয়োজন স্থলে তাঁহারা মানুষের গড়া স্মৃতি-শাস্ত্র আর মানুষের গড়া দণ্ডবিধি আইন উভয়ই অবহেলে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। যথার্থ একটি মানুষ যে, সে সহস্র-কোটি অভিনেতার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং শক্তিমান্, তাঁহার জীবন প্রতি পদক্ষেপে একমাত্র তাহারই প্রমাণ।

নিজের জীবনের অলোক-সামান্য মহত্ত্বের বৈচিত্র্য দিয়া যদি মানুষ নামের গৌরব বাড়াইয়া দিয়া যাইতে না পারিলে, তবে আর তোমাকে বড় বলিব কেন? মানুষ বলিয়া পরিচয় দেওয়া এক কথা, আর, মানুষ নামের গৌরব বাড়ান আর এক কথা। খাঁটি মানুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া খাঁটি হিসাবের

পাকা মাপের ষোল আনা ওজনের পুরাপুরি মানুষটি হওয়া বড় কঠিন কথা; কিন্তু নিজের জীবনের শক্ত শক্ত ঘাত-প্রতিঘাতের তাল সামলাইয়া স্থির সঙ্কল্পে অভিনব পন্থায় চলিয়া যাঁহারা জগতের কর্ম্মে বহুমুখতা ফুটাইয়া তোলেন, নিজের জীবনটাকে যাঁহারা বিধাতার নূতন সৃষ্টি বলিয়া গণিত করেন, শতাব্দীর পর শতাব্দীও যে জীবন-কুসুমের সুষমা একটু মাত্র ম্লান হয় না, সৌরভ একটুমাত্র হ্রাস পায় না—তপস্যার অসামান্য প্রভাবে যাঁহারা তেমন সুষমামণ্ডিত, তেমন সৌরভ-শালী হন, তাঁহারা কেবল যে মানুষই হন, তাহা নহে, মানুষ-নামের গৌরবও বাড়াইয়া যান। তেমন হওয়া কঠিনতর, কিন্তু তোমার জীবনের মধ্যবর্ত্তিতায় সহস্র অন্ধের নয়ন না ফুটিলে, সহস্র মূকের মুখ না খুলিলে, যুগযুগান্তর ধরিয়া অসহায় সহায় না পাইলে, বিজন যাত্রা-পথের সাথী তার না মিলিলে, জয়-ডঙ্কা দিয়া সাধারণে তোমাকে শত অভিনন্দন দিলেও আমি কেমনে তোমাকে মহৎ বলিয়া মানিব? যে গাছের ছায়ার নীচে বনের আর সব গাছ পড়িয়া থাকে, সেই না বনস্পতি? যে পাহাড়ের পায়ের কাছে শত শত পাহাড়ের মাথা শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে নত হইয়া থাকে, সেই না পর্ব্বত?

জীবিত ব্যক্তি মরে, কিন্তু জীবন ত' কখনও মরে না, একদিন যাহারা জীবিত ছিল, আজ তাহাদের কেহ নাই; কিন্তু তাই বলিয়া পৃথিবীটা ত' আর নিস্তব্ধ শ্মশান হইয়া যায় নাই!

নিত্য সেই নব-জন্মোৎসবের উলুধ্বনি শুনিতেছে! মৃতের জীবন তাঁহার বংশধরের মধ্য দিয়া অনন্ত স্রোতে বহিয়া যাইতেছে,—ইহা ভগবানের চিরন্তন আত্ম-বিকাশ। ভগবানের এই বিকাশ তোমার জীবনে পরিপূর্ণ সার্থকতার দাবী করিবে না, যদি তুমি একদিন ঘুমাইয়া পড়িলে, তোমার হৃৎপিণ্ডটা তোমার সাথে ঘুমাইবার ছুটী চাহে। তুমি জগৎ-কল্যাণ-মহামন্ত্রে দীক্ষিত, ত্যাগ-ব্রতের সাধক, অমৃতত্বের উপাসক; আত্মাহুতির হবিঃ, তোমার মধ্যে মাত্র একটী খাঁটি মানুষ দেখিয়াই তৃপ্ত থাকিতে পারে না, আমি একটী অতি মানুষ চাই, একটী বিশ্ববন্দিত মহামানব চাই।

জ্বালাও আগুন, জ্বালাও। ত্যাগের অনলে বুকের পাঁজরে আগুন ধরাইয়া দাও। সকল স্বার্থ পুড়িয়া ছাই হউক, তোমার আত্মাহুতির ভস্মকণা হইতে এক একটী করিয়া শত সহস্র স্বার্থত্যাগী পরার্থকারী পরসুখসুখী আত্মসুখবিমুখ মহাপ্রাণ মহাপুরুষের অভ্যুদয় হউক। জগৎ ইহারা পূর্ণ করুক—জ্ঞানে আর গুণে, প্রাণে আর গানে, প্রীতিতে আর মাধুর্য্যে প্রেমে আর পবিত্রতায়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
আপনার জন

একবিংশ পত্র

৬ই ফাল্গুন ১৩৩০

স্নেহাভিষিক্তেষু,—

স্নেহের—, যার মেরুদণ্ডটা যত শক্ত, তার আত্মবিসর্জ্জনের মূল্য তত বেশী, তার উৎসর্গে জগতের তত বেশী কল্যাণ। "প্রাণ যাক"—এই পণ করিয়া যাহারা কাজে নামে, বুদ্ধির জোর না থাকিলেও, একমাত্র আগ্রহের জোরে, একনিষ্ঠার বলে তাহারা রণ জয় করিয়া লয়। জীবনকে এবং জীবনের সুখ-দুঃখকে তুচ্ছাদপি তুচ্ছ করিয়া যাহারা বজ্রের মুখে বুক পাতিয়া দেয়, হিসাবী বহুদর্শীর অনুমানকে মিথ্যা করিয়া জয়শ্রীকে তাহারাই লাভ করে। তাই তোমাকে বলিবার কথা ঐ একটীই আছে,—সাহস কর, অগ্রসর হও, নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিবে। মেরুদণ্ড বাঁকা করিও না, সোজা হইয়া দাঁড়াও, বক্ষ স্ফীত কর, মস্তক উন্নত কর, সদর্প দৃষ্টিতে বিশ্বটাকে একবার নবীন যৌবনে দেখিয়া লও। হতাশার দৃষ্টিতে যাহাকে রুগ্ন, আতুর বলিয়া ভাবিয়াছ, ভরসার দৃষ্টিতে তাহাকে সুস্থ, সবল ও স্বচ্ছন্দ বলিয়া অনুভব কর।

মেরুদণ্ডের জোর থাকিলে, বুদ্ধি কমই একটু থাকিল! যে বুদ্ধিমানের বুকের ছাতিটা ভাঙ্গা, সে জগতের সকল বোকার সেরা। বুদ্ধি থাকা ভাল কথা, কিন্তু উৎসর্গ ব্যতীত তাহার শুদ্ধি সাধিত হয় না। অশুদ্ধা-বুদ্ধি রজঃস্বলা নারীর ন্যায়

অস্পৃশ্যা। মাথা থাকিলেই চলিবে না, মাথাটাকে কাজে আনিতে হইবে, কাজের মত কাজে আনিতে,—প্রয়োজন হইলে,—সেইটাকে স্বেচ্ছায় খোয়াইতে হইবে, নতুবা মাথা শুধু বাধারই সৃজন করে। ঝড়ে নৌকা ডুবিলে সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা-বুদ্ধির জাহাজও ডুবিয়া যায় কিন্তু সক্ষম বাহুযুগল কখনও ডুবিতে জানে না। বিপদে যদি কাজে না আসিল, সংগ্রামের সুদীর্ঘতা দেখিয়া যদি হতাশ হইল, সহায় হারাইলে যদি মুসড়িয়া পড়িল, নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া অমানুষ বিক্রমে যদি আমাকে অগ্রগামীই না করিল, তবে কিসের বা সে মেধা, কিসের বা সে মনীষা। যে প্রতিভা প্রয়োজনে পড়িয়া, জানিয়া শুনিয়া কর্ম্মের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করিয়া লোকনিন্দার হাত এড়াইতে চায়, তাহা আমার প্রার্থনীয় নয়। আমি চাই সেই পৌরুষ, যাহা সব অগ্রাহ্য করিয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্রেই মরিতে ভালবাসে।

প্রশ্ন বটে, পৌরুষ বড়, না প্রতিভা বড়। তুচ্ছ প্রশ্ন! প্রতিভার মুখে শত ভাষার সহস্র ছন্দে এই সমস্যার বিবৃতি শুনিবে কিন্তু পৌরুষ একটি মাত্র মৌনকর্ম্মে তাহার সমাধান করিয়া দিবে। চাই মৌনমুখরতা, মুখর মধু কথা চাই না! কে কি করিয়াছে, কেন কি করিয়াছে, অবসর থাকিলে সে সব বিচার ভাল। কিন্তু সে সবে দৃষ্টি কিছু কমাইয়া আমি কি করিয়াছি, কেন কি করিয়াছি, কি করিব এবং কেন করিব, তাহা অভ্রান্ত ভাবে বুঝিয়া লইয়া তিলমাত্র সময় নষ্ট না করিয়া

অর্জ্জুনের মত স্থির দৃষ্টিতে তীরক্ষেপই শ্রেয়ঃ। বই পড়িলে, বক্তৃতা শুনিলে জ্ঞান-বৃদ্ধি হইতে পারে কিন্তু কর্ম্মঠতা সব সময়েই বাড়ে না।

শ্রমেই শ্রমশক্তি আসে। কর্ম্ম কর, মেরুদণ্ডের বল বাড়িবে। মৌন কর্ম্মে গা ঢালিয়া দাও, অভ্রান্ত কর্ম্মের ক্ষমতা জাগিবে। মৌনের মধ্য দিয়াই মহাশক্তির জাগরণ হয়, মৌনেই নির্ভুল পন্থার নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। তোমার ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল, সেই প্রত্যয়ে নির্ভর করিয়া নির্ভয় হও। দেহে মনে পবিত্র হও, পর-প্রবঞ্চনা ও আত্মপ্রতারণার দুর্ব্বুদ্ধি থাকিলে তাহা দূর করিয়া দাও, ফাঁকী দিয়া বিনাশ্রমে কার্য্যসিদ্ধির আশা ছাড়। মনুষ্য-জীবনকে ভাগবত বৃন্দাবন জানিয়া নিজ জীবনের তরঙ্গ-হিল্লোলে শ্রীভগবানের লীলারস আস্বাদন কর।

মুখরেরা আস্বাদন করিতে জানে না,—মৌনী জানে। এই আস্বাদনকে না পাইলে আবার মেরুদণ্ডও শক্ত হয় না, কারণ, যে ইহা না জানিয়াছে, তার কর্ম্ম চিরকাল অপকর্ম্মে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই রসের রসিক হইলে মানুষ কর্ম্মের অধিকারী হয়, কর্ম্মের গহন গতির সুষ্ঠু পরিচয় পাইয়া কর্ম্ম-কৌশলী হয়। সর্ব্বকর্ম্মের কৌশল মৌন সংযমে জানিয়া লইয়া, হে জগতের সেবক, সেবাচর্য্যায় আত্মজীবন সার্থক কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

তোমার আপনার জন।

দ্বাবিংশ পত্র

৬ই ফাল্গুন ১৩৩০

স্নেহভাজনেষু :—

স্নেহের—, কুণ্ডলীকৃত গঞ্জিকা-ধূমের বিস্তার দিয়া সাধুর সাধুত্ব ও সিদ্ধত্ব বিচার করিবার দিন চলিয়া গিয়াছে, একমাত্র নামের নেশায় পাগল হইয়া যাঁহারা ভগবানের কাজে আত্মসমর্পণ করিয়াও গোপণতা রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদের যুগ আসিয়াছে। যে যুগে বাহিরের মানুষ আসিয়া মানুষকে পথভ্রষ্ট করিত, যে যুগে বাহ্য অনুষ্ঠানের চাপে ভিতরের প্রাণটী অজ্ঞাতে মরিয়া যাইত, সে যুগ যাইয়া আজ নূতন যুগ আসিয়াছে। মরমের মানুষ পথ চিনাইয়াছেন বলিয়া বাহিরের মানুষের কদর কমিয়া গিয়াছে। অন্তরের বাণী শুনিতে শিখিয়াছে বলিয়া যুগের মানুষ বাহিরের আস্ফালনকে তুচ্ছ করিয়াছে।

যে যুগের কথা বলিলাম, সে যুগের আগমন আমার মানসনেত্রে দেখিতেছি, প্রকৃত প্রস্তাবে কিন্তু তাহা বাস্তব প্রত্যক্ষে আসে নাই। "আসিবে" "আসিতেছে", ভাবিতে ভাবিতে বারংবার পুলকাঞ্চিত হইতেছি আর নিজেই তাহাকে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ দিয়া সাজাইতেছি এবং প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করিতেছি। কিন্তু আমি যাহাকে কল্পনায় পাইয়াছি, আমার এই জড় দেহ মাটিতে মিশাইলেও কল্পনাকে সত্য করিবার সাধ

ফিরিয়া যাইবে না। মানুষের দেহ মরিতে পারে কিন্তু মানুষ ত' মরে না!

সত্যের এক অব্যর্থ শক্তি আছে। সত্যের উপরে নির্ভয়ে এবং নির্ভরপোষক আত্মবিশ্বাসে শক্তির অনন্ত উৎস লুক্কায়িত রহিয়াছে, সত্য যে অপরাজেয়, সত্য যে নিত্যবিজয়ী, সেই বিশ্বাসের মধ্যে অমোঘ সাফল্য প্রসুপ্ত। বিশ্বাসকে জাগাইলে সাফল্যও জাগিয়া উঠিবে। শত জন যে পন্থাকে অসম্পূর্ণ ও অযোগ্য বলিয়া চির-পরিহার করিয়া গিয়াছে, বিশ্বাস থাকিলে, সেই পথেই চলিয়া তুমি সাফল্যকে করায়ত্ত করিবে। শত জনে যে অস্ত্রখানাকে ভগ্ন ও অকর্ম্মণ্য বলিয়া রণক্ষেত্রে ফেলিয়া পলায়নপর হইয়াছে, তুমি ঠিক তাহাকেই মাটী হইতে কুড়াইয়া লইয়া দিগ্বিজয় করিবে। শত জনে যাহাকে দুর্যোগ বলিয়া উপেক্ষা করিয়া সুলভ সৌভাগ্যের অন্বেষণ করিয়াছে, তুমি তাহাকেই সুযোগ বলিয়া দুর্লভ সৌভাগ্যকে নিশ্চিতরূপে লাভ ক'রবে।

আমার স্বপ্নকে সত্য করিতে হইলে এই ভাঙ্গা অস্ত্র কুড়াইয়া লইয়া বিশ্বাসের শক্তিতে বাধা-বন্ধুর পথে অগ্রসর হইতে হইবে। যে যুগ 'আসি' 'আসি' করিয়া আসিতেছে না, তাহাকে শীঘ্র আনিতে হইলে আরামে চলিবে না, আয়াস চাই। অভিনয়ে অনাদর করিয়া, যুগযুগাচরিত অসত্যকে অগ্রাহ্য করিয়া, বহিরনুষ্ঠানহীন নীরবতায় সুনির্ম্মল সত্যযুগকে আনিতে হইলে বুকের পাটা চাই; গুণ, জ্ঞান, পাণ্ডিত্যে কুলাইবে না। ঝঞ্ঝার

বায়ু যাহাকে উৎখাত করিতে পারে না, সাগরের গর্জ্জনমুখর বিক্ষুব্ধ তরঙ্গাক্রোশ যাহাকে কম্পিত করিতে পারে না, সেই গিরিবরের মূল অনেক নীচে, অনেক গভীরে, অনেক নিবিড়ে, —কেহ কখনও খুঁজিয়া পাইতে পারে না।

তুমি একটী মাত্র ব্যষ্টি ; তুমিই যে দিন আবার সমগ্র সমষ্টি হইবে, সেই দিন এই যুগের অরুণ তাহার কিরণজাল বিকিরণ করিবেন। যে-তুমি সকলের অন্তর হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া সকলের সর্বস্ব হইবে এবং সকলকে নিজের সর্বস্ব মনে করিবে, সেই-তুমি যে দিন তোমার দেহ ও মস্তিষ্কের প্রত্যেকটী পেশী, শিরা, উপশিরা এবং মনের প্রত্যেকটী বৃত্তিকে স্বেচ্ছায় চালাইতে পারিবে, সেদিন নবযুগ আসিবে।

কাম-ক্রোধ মানুষের জীবন-তন্তু খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে। ভাঙ্গা কাচ জোড়াইবার, ছিন্ন তন্তু বাঁধিবার উপায় যেদিন তোমাকে আপনা হইতে জাগিয়া উঠিবে এবং সে জাগার সার্থকতা রাখিবার জন্য যেদিন নেতৃত্বাভিমান ছাড়িয়া তুমি আত্মোপলব্ধ তত্ত্ব প্রচারে বাক্য ব্যয় অপেক্ষা সাধনের মৌন শক্তিকে প্রয়োগ করিতে অধিকতর ক্ষমতাবান্ হইবে, সেদিন এই নবযুগের নবমন্ত্রে দীক্ষিত ঋষিরা তোমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইবেন।

আমি সেই যুগকে স্বপ্নে দেখিয়াছি, তোমরা তাহাকে বাস্তবে বন্দনা কর।

আশীর্বাদক

তোমার আপনার জন।

ত্রয়োবিংশ পত্র

১০ই ফাল্গুন, ১৩৩০

স্নেহের—,

* * আমি তোমাকে জ্ঞান দান করিতে পারি না, কেবল কৌতূহল জাগিবার সহায়তা করিতে পারি। তোমার আত্মা ত' নিজেই সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহাকে আবার কি শিখাইতে যাইব? মনে কৌতূহল জাগিলে আত্মায় সাড়া পড়ে। তখন তিনি নিজেই উত্তর দিয়া অশান্ত মনকে শান্ত করিয়া দেন।

তোমরা জগৎ-কল্যাণব্রতী, পরার্থে উৎসর্গীকৃতজীবন, ব্রহ্মচারী। তোমাদের কৌতূহলকে অখণ্ড পরমার্থ-তত্ত্বে যেমন জাগাইয়া রাখা প্রয়োজন, আবার ইহজগতের দুঃখ-ক্লেশ-পীড়িত, শোক-তাপ-মর্দ্দিত দীন-দরিদ্র ভ্রাতা-ভগ্নীগুলির দিকেও তেমনই সজাগ করা প্রয়োজন। নিজের মুক্তিই তোমাদের ত' লক্ষ্য নহে। সবাকার মুক্তি সহজ লভ্য করিবার জন্য নিজের মুক্তিকে তুচ্ছ ও অগ্রাহ্য করিয়াই ত' তোমরা অন্বর্থনামা ও ধন্যজন্মা! তাই, সেবাধর্ম্ম পালন করিতে যাইয়া তোমাদিগকে জগতের প্রত্যেকেরই সেবক হইতে হইবে। তোমার বিশ্বময় প্রভুকে নিখিল ভুবনের সকল কিছুর মধ্যে দর্শন করিয়া তাঁহার সম্যক্ সেবা-সাধনের প্রচেষ্টাতেই তোমার মানব-জন্ম লাভের সার্থকতা। তুমি আর তোমার পরমোপাস্যে কোন পার্থক্য নাই। যিনি সেব্য, তিনিই সেবক হইয়াছেন, পুত্রের মধ্যে

পিতাই বিরাজ করিতেছেন, পিতার মধ্যেই পুত্র রহিয়াছেন। স্বীকার করিলেই এই দ্বিত্বের পার্থক্য থাকে, স্বীকার না করিলে থাকে না। যখন দ্বিত্ব স্বীকার করিবে, তখন জগৎ-সেবায় ভগবৎ-সেবা হইবে ; যখন ইহা স্বীকার করিবে না, তখন জগৎ-সেবায় আত্মসেবা হইবে। যাহার হিসাবের খাতায় একমাত্র আত্মা ব্যতীত অপর কাহারও নামে কোনও জমা বা কোন কিছুরই অঙ্কপাত থাকে না, তার পক্ষে আত্মসেবাই চরম-চরিতার্থতার সেবা ; আবার এক আত্মা ব্যতীত অপর কিছুরই সংবাদ যিনি জানেন না, তিনি আত্মার সেবা করিয়াই জগতের সেবা করেন। জ্ঞানী ব্যক্তি যাহাই বলুন, এই চর্ম্মচক্ষুগ্রাহ্য জগৎটাও একান্তই মায়া নহে।

তোমার অসীম, অমিত, অপার শক্তি সীমাবদ্ধতার সংস্কার জালে ঘেরা পড়িয়াছে,—এই জালের দড়ি তোমাকে ছিঁড়িতে হইবে। জালের আবেষ্টনের মধ্যে থাকিয়াই যেটুকু বল প্রয়োগ সম্ভব, তুমি অবশ্যই তার সবটুকুর সদ্ব্যবহার করিবে। এখন তোমার শক্তি সসীম, কিন্তু জাল ছিঁড়িলেই অসীম হইবে। বর্ত্তমানে তোমার সামর্থ্যের পুঁজি কম থাকিলেও তোমার ভাবনায় পড়িলে চলিবে না। নির্ভয় হইয়া, যেটুকু সম্বল আছে বলিয়া অনুভব কর, সেইটুকুকেই কাজে লাগাইয়া তাহাকে নিঃশেষে সার্থক করিতে প্রয়াসী হইবে।

দেহ ও মন এই দুইটী যন্ত্র-সহায়ে তোমার আভ্যন্তরীণ শক্তি-পুঞ্জ প্রযোজিত এবং অভিব্যঞ্জিত হইতেছে। দেহ যদি একটী দশ-মর্দ্দা হইয়া থাকে, মন তাহা হইলে একটি বিশ-মর্দ্দা। "মারো ধাক্কা হেইয়ো"—বলিয়া দশ-মর্দ্দা দিয়া ধাক্কা দাও, গায়ে তৎক্ষণাৎ জোর আসিবে, কার্য্য-সিদ্ধি ত' হইবেই। প্রয়োগেই শক্তির উপচয় এবং সার্থকতা,—অবশ্য অপ্রয়োগে নহে।

তোমার দেহে আধ-ছটাকের বেশী সামর্থ্য না থাকিতে পারে, কিন্তু এটুকুই তুমি কাজে লাগাও। কম আছে ত' আছে, কিন্তু কম বলিয়া কোন কাজে না লাগিয়া সে অব্যবহারে বৃথাই শুকাইয়া মরিয়া যাইবে কেন? ছেঁড়া কাঁথায় রাজা-রাজড়ার সেবা না হইতে পারে, দীন-কাঙ্গালের কি কোন প্রয়োজনে উহা লাগিবে না? কল্যাণ-কর্ম্মীর কাছে রাজা-রাজড়ার চেয়ে দীন-কাঙ্গাল যে অনেক বড়! সুতরাং ক্ষুদ্র হইলেও তোমার শক্তিকে বন্ধ্যা থাকিতে দিবে না, তাহাকে জগৎ-কল্যাণপ্রসূ করা চাই।

ভাঙ্গা দেহে মনটা তেমন স্বচ্ছন্দে থাকে না, তথাপি সে জগৎ-কল্যাণেচ্ছা সব সময়েই করিতে পারে। মেরামত করিবার সরঞ্জাম ও উপাদান থাকিলে দ্রুত মেরামত করিয়া লও, আলস্য করিও না। তাহা না থাকিলে মূল-মিস্ত্রী শ্রীভগবানের হাতে মেরামতের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হও এবং অক্ষুব্ধ চিত্তে জগতের কল্যাণ-চিন্তাতে তৎপর হও। গরীব বাড়ীওয়ালা যেমন ভাঙ্গা বাড়ী ভাড়া দিয়া ভাড়াটিয়ার টাকাতেই ঘর-দুয়ার

মেরামত করিয়া লয়, তুমিও জগৎ-কল্যাণের কর্ম্মী, মনটাকে সহ দেহ-ঘর ভগবানকে ভাড়া দিয়া ঘর মেরামতের উপায় দেখ। এ দেহ যখন জগৎ-কল্যাণই করিবে, তখন সকল কল্যাণের সূত্র যিনি হাতের মুঠে ধরিয়া রাখিয়াছেন, তিনি ইহাকে জগতের কাজের উপযোগী করিয়া লইবেনই। ইহা তাঁহারই নিজ গরজ। তুমি ভুবন-মঙ্গল-তরে ভগবানের হাতে দেহ-মন সমর্পণ করিয়া দাও। তুমি আত্মসমর্পণ করিয়াই খালাস পাইয়াছ জানিও—পরবর্ত্তী খাটুনী তাঁর, যিনি ইহার মালিক হইলেন। পাহাড়-পর্ব্বতে ভরা, বন-জঙ্গলে বোঝাই একটা অপয়া জমি তুমি অপরের কাছে বিক্রী করিয়া দিয়াছ, তোমার প্রাপ্য-গণ্ডা—ধর, আত্মপ্রসাদ ও নিশ্চিন্ততা,—তুমি গণিয়া বুঝিয়া ঘরে আনিয়া সিন্দুকে তুলিয়াছ, এখন যদি এ পাহাড় কাটিয়া সমতল করিতে হয়, এ জঙ্গল উপড়াইয়া আবাদী জমি করিতে হয়, খন্তা-কোদাল বা দা-ছুরীর দাম এবং লোক-লস্কর, কুলী-মজুর প্রভৃতির পারিশ্রমিক তোমাকে বহন করিতে হইবে না। যাঁর জমি তিনি পারেন ত' পাহাড় কাটিবেন, না পারেন ত' বসিয়া থাকিবেন, উহাতে তোমার কি? ইচ্ছা হইলে তিনি ডিনামাইট বিদারণ করিয়া পাহাড়ের পাথর চূরমার করিবেন নতুবা কামান দাগিয়া পর্ব্বতের চূড়া উড়াইয়া দিবেন, এই সবের উপরে তোমার আর কথা কহিবার কিছু নাই।

ইচ্ছার শক্তি অলঙ্ঘ্য। "এই দেহ জগতের কল্যাণে লাগুক", এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ইহা জগতের কল্যাণে লাগিয়া যায়। যে যাহার যোগ্য, সে সেই কাজেই আসে। ছাগল দিয়া জমি-চাষ চলে না; ইঁদুর দিয়া যুদ্ধ চালান যায় না। চাষের কাজে চাই গরু-মহিষ; যুদ্ধের কাজে চাই হাতী-ঘোড়া। তুমি কি মনে কর, তোমার দেহ জগৎ-কল্যাণে অযোগ্য থাকিতে তাহা কাজে লাগিবে? কাজে আসিবার আগে ইহার মধ্যে যোগ্যতার সঞ্চার হওয়া চাই। আকাঙ্ক্ষার ঐকান্তিকতা ইহাতে যোগ্যতা আনিবে; অযোগ্যতা দূর করিবে। "নাই—নাই" বলিতে বলিতে সাপের বিষও দূর হইয়া যায়। "নাই—নাই" বলিতে বলিতে অযোগ্যতাও দূর হইয়া যাইবে না কেন?

মনের ইচ্ছা যখন দেহের মধ্য দিয়া কার্য্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে দেখিবে, তখনই বুঝিবে যে, দেহ কল্যাণ-কর্ম্মে কিছু যোগ্য হইয়াছে। মনে যখন জাগিল, ব্রহ্মচর্য্য প্রচার করিতে হইবে, তখন তাহার প্রকৃত বহির্বিকাশ কিছু নাও থাকিতে পারে। ক্রমশঃই যখন এই কথাটা বারংবার মনে জাগিতে থাকিবে, তখন চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতে দেহটা একটু গঠন পাইবেই; কারণ, চিন্তায় দেহের আণবিক রূপান্তর ঘটে। তখন তোমার নিজের জীবনে আগে ব্রহ্মচর্য্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আরম্ভ হইবে। কারণ, নিজে আচরণ না করিয়া অবতার-খ্যাত

মহাপুরুষেরাও জগতে কোনও সংস্কার প্রবর্ত্তন করিতে পারে নাই। নিজে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে গিয়া চিন্তার ঐকান্তিকত্ব ও প্রগাঢ়তা আরও বাড়িয়া যাইবে। তখন দেহের আণবিক রূপান্তর আরও দ্রুততর ও সুষ্ঠুতর হইতে থাকিবে। তখন দেখিবে, মনের কথা আর মনে চাপিয়া রাখা যায় না, অজ্ঞাতসারে তাহা বাহিরিয়া পড়ে। কিন্তু মুখে বলিয়া কয়জনকে তোমার কথা শুনাইতে পার? সুতরাং চিন্তার গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে তোমার লেখনী-মুখে তোমার বাণী চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে এবং চেষ্টা নিষ্কাম হইলে যুগে যুগে মানব-মনে কৌতূহল জাগাইবে, প্রেরণা যোগাইবে। কিন্তু কলমের আঁচড় কাটিয়াই কর্ম্মী তৃপ্ত হইতে পারেন না। তখন তুমি হয়ত মা-বাপ, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলকে একেবারে মনে-প্রাণে ছাড়িয়া-ছুড়িয়া বাহির হইয়া পড়িবে। নিঃস্বার্থ সদাকাঙ্ক্ষার তাড়নে কত সমুদ্রের তরঙ্গাঘাত বুক পাতিয়া লইবে, তাহা কে জানে? কত গান গাহিবে, কত কথা কহিবে; কেহ শুনিবে, কেহ শুনিবে না; কেহ বুঝিবে, কেহ বুঝিবে না; কেহ মানিবে, কেহ মানিবে না; যে শুনিবে, সে হয়ত কাণ পাতিয়া শুনিবে না অথবা তেমন ভাবে শুনিলেও হয়ত হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না; যে বুঝিবে, সে হয়ত ভাল করিয়া বুঝিবে না, অথবা যদি বোঝেও, তবু হয়ত তার পূর্ব্বসঞ্চিত সহস্র প্রকারের বিরুদ্ধ বুদ্ধি-প্রবোধের সহিত মিল খাওয়াইতে সমর্থ হইবে না; যে মানিবে,

সে হয়ত মনে-প্রাণে মানিবে না, অথবা যদি ইহপরকাল তুলায় ধরিয়া ইহাকে মানিয়া লয়, তবু হয়ত প্রাগ্‌লব্ধ চিত্তসংস্কার-নিচয়ের দাসত্ব-নিগড় সবল আস্ফালনে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিবে না,—তখন তুমি বহির্ম্মুখ কর্ম্মকে গৌণ জানিয়া অন্তর্মুখ তপঃসাধনে আত্ম-নিয়োগ করিবে, নিখিল-ভুবন-তরে তোমার প্রাণের আকুলকল্যাণৈষণাকে অবার্থ, অমোঘ, অলঙ্ঘ্য করিবার সাধনায় বিমগ্ন হইবে। এই যে ধাপে ধাপে তোমার ক্রমোন্নতি ঘটিল, ইহা কি তোমার যোগ্যতার অপেক্ষা রাখে নাই? পুনশ্চ, ইহা কি তোমার যোগ্যতার বিকাশ-সাধনও করে নাই?

চিন্তা যদি অকপট হয়, তবে তার গর্জ্জন বজ্রের চেয়েও বেশী, শক্তি ষ্টিম-ইঞ্জিনের চেয়েও বেশী, ব্যাপ্তি বাতাসের চেয়েও বেশী। কল্যাণী চিন্তা অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দাও,—কাল-ক্রমে তাহা সর্ব্বজয়িনী হইবেই। চিন্তার মধ্যে ফাঁক না থাকিলে, কাজের মধ্যেও ফাঁক থাকে না। জগৎকে পরার্থপ্রেরণা দিতে হইবে,—কর্ম্মী আসিয়া সভামঞ্চে দাঁড়াইয়া জলদ-গম্ভীর স্বরে যেটুকু দিবার দিয়া গেলেন। বক্তৃতায় যাহা হইবার তাহা হইল,—তিনি সংবাদ-পত্রে প্রবন্ধ লিখিলেন। কেহ তাহা পড়িল, কেহ তাহা পড়িল না, কেহ বুঝিল, কেহ বুঝিল না। যেটুকু কাজ হইবার হইল,—তিনি রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিয়া সেই পরার্থের কথাই তুলিলেন। কাহারও প্রাণ গলিল, কাহারও গলিল না। তিনি এক অজ্ঞাত পল্লীর একান্তে যাইয়া ছাত্র

পড়াইতে বসিলেন। কোনও ছাত্র তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইল, কেহ হইল না। তিনি চাষা-ভূষার দলে যাইয়া মেঠো আলাপ জুড়িলেন। ইহাতে কাহারও ভিতর কিছু কাজ হইল, কাহারও ভিতর হইল না। তখন তিনি বৈরাগী সাজিয়া দুয়ারে দুয়ারে পরার্থ-তত্ত্বের গান গাইয়া বেড়াইলেন। ঘরের কোণের কুলবধূরাও তাঁহার প্রাণ মনোহারী সঙ্গীত-ধ্বনি শুনিয়া গৃহকোণ হইতে মুখ বাড়াইয়া কাণ পাতিল, কেহ বা ছুটিয়া ঘরের বাহিরে আসিল, অতর্কিতে তার সযত্ন-রক্ষিত মুখাবগুণ্ঠন খসিয়া পড়িল, প্রভাতের তরুণ রবিরশ্মি তাঁর চোখে-মুখে স্বর্গীয় দীপ্তির ঝলক তুলিয়া গেল, কিন্তু চমক ভাঙ্গিলে দেখা গেল, ভাবের বাউল যে গান গাহিয়া গেলেন, কেহ তাহার মর্ম্মবাণী গ্রহণ করিল, কেহ শিক্ষার অভাবে, সাহসের অভাবে বা চর্চ্চার অভাবে পারিল না। এবার তিনি পাগল সাজিলেন, যুক্তির গাঁঠ্রি আর ন্যায়ের পুঁথি জলের স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া রাস্তায়, ঘাটে ছেলের দলের ইট্-পাঠ্কেল খাইলেন, মেয়ের দলের হাসি-বিদ্রূপ সহিলেন, উচ্ছৃঙ্খল যুবকের থুথুর বোঝা হাসিমুখে মাথা পাতিয়া লইলেন : আবার তাহাদিগকেই ডাকিয়া আনিয়া মুঠি ভরিয়া মিঠাই, মণ্ডা, ফুল-বাতাসা বিলাইলেন,—কেহ তাঁহাকে বদ্ধ-পাগল বলিয়া গালি দিল, কেহ তাঁহাকে চোর বলিয়া কিলাইল, কেহ তাঁহাকে নির্ব্বোধ বলিয়া অনুকম্পা দেখাইল, কেহ তাঁহাকে সাধু বলিয়া আদর করিল, পার্থিব ধন-রত্ন

লাভের লোভে কেহ তাঁহার পিছু পিছু বৃথাই ঘুরিয়া মরিল, কেহ বা তাঁহার যথার্থ মাহাত্ম্য বুঝিল এবং পরার্থের পরশমণি লাভ করিয়া আবার তাঁহারই মত পাগল হইল ; এখানেও কিছু কাজ হইল, কিছু হইল না। কর্ম্মী এই ক্ষয়শীল দেহ লইয়া কয় পালা যাত্রা গান গাহিবেন ? একদিন তিনি নিবিড় মৌনে বসিয়া পড়িলেন, কারণ, সহসা তিনি সংবাদ পাইয়াছেন, মৌনের মধ্য দিয়া নাকি বিশ্ব-জগতের কর্ম্ম-মুখরতা জাগিয়া উঠিবে।— এইরূপে জগৎ-কল্যাণ-কর্ম্মী না-ছোড়-বান্দা হন। তাঁর এই ঐকান্তিকতা একমাত্র চিন্তার এবং আত্মসমর্পণের অকপটতা হইতেই উদ্ভূত হয়।

আজ এই অকপটতা জাগাও, গভীর একাগ্রতার বলে অসাধ্যকে সুসাধ্য কর, অসম্ভবকে সম্ভব কর, পঙ্গু দিয়া গিরি-লঙ্ঘন করাও, বালুর বাঁধ দিয়া সমুদ্রের গতি-রোধ কর। অভিধানের যে পাতায় "অসম্ভব" কথাটা লেখা আছে, সেই পাতাটা ছিঁড়িয়া ফেল, হৃদয়ের যে তন্ত্রীতে দুর্ব্বলতার সুর বাজিতেছে, সাঁড়াশী দিয়া তাহা টানিয়া খুলিয়া ফেল। তোমরা বিশ্বামিত্র—নূতন সৃষ্টির যাজ্ঞিক, তোমাদের মন্ত্রবলে ব্রহ্মার সৃষ্টি হীনপ্রভ হইয়া যাইবে।

শুভাশীষ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক,

আপনার জন।

চতুর্বিংশ পত্র

শিবচতুর্দ্দশী
২০ ফাল্গুন, ১৩৮০

কল্যাণকলিতেষু :—

স্নেহের—, * * * * শুধু নামজপ বা নামকীর্ত্তন করিলে চলিবে না, জপ বা কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তোমার বুদ্ধি ও প্রতিভা দ্বারা সেই নামের যতটুকু অর্থ হৃদয়ঙ্গম বা আবিষ্কার করা যায়, তার সবটুকু গভীরভাবে ধ্যান করিতে হইবে। নতুবা নাম-জপাদি কপটাচার মাত্র হইবে। ধর্ম্মের অভিনয় করিয়া সকল যুগেই একদল অধার্ম্মিক ধর্ম্মের পথে আসিয়া পড়িয়াছেন সত্য, কিন্তু ইহা কোটি কোটি বিরুদ্ধ দৃষ্টান্তের অল্পসংখ্যক ব্যতিক্রম মাত্র। ব্যতিক্রম দিয়া নির্ভুল মীমাংসায় পৌঁছা যায় না।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভগবানের নামোচ্চারণ বা স্মরণকালে নিজ-সুখ-চিন্তা, স্বার্থ-বোধ বা অহমিকা রহিয়াছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নাম যে ঠিক ঠিক ভাবে নেওয়া হইতেছে না, ইহা নিশ্চিত রূপে জানিও। অহোরাত্র নাম জপিবে, কিন্তু যে জপনে মনকে একাগ্র ও একনিষ্ঠ কর নাই, তেমন জপে প্রকৃত লাভ অল্পতর। যার মন নামের রসে ডুবিয়া যাইতে চাহিতেছে না, দিবারাত্রি জপ করিতে করিতে এক সময়ে তারও সুদিন আসে,—ইহা নামেরই অপূর্ব্ব ক্ষমতা। ভগবান তাঁর নামের শক্তিকেও নিজের শক্তির ন্যায় অসীম ও অফুরন্ত করিয়া রাখিয়াছেন ; কিন্তু

নামের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া একবার নাম করিতে পারিলে শত যুগের নাম হইয়া যায়। 'এক ডাকে ফুরায়ে দে মা জন্মভরা ডাকাডাকি।'—প্রথমেই চিত্ত স্থির হইতে চাহিবে না সত্য কিন্তু অভ্যাসের অসাধ্য কিছু নাই। অহরহঃ চেষ্টা করিতে করিতে নিশ্চয়ই তোমার মনঃস্থৈর্য্যের শক্তি জাগরিত হইবে এবং তোমার নাম-নেওয়াকে সার্থক করিয়া তুলিবে।

ভগবানের নাম-লওয়ার সাথে জগৎ-কল্যাণের বিরোধ নাই। বিশ্বজগৎ যাঁর কটাক্ষে সৃষ্ট হইয়াছে, তাঁর নাম দিয়া বিশ্বজগতের কল্যাণ জাগিবে না, তবে কিসে জাগিবে? জগতের মধ্যে জড় ও চৈতন্যের দ্বৈত-লীলার মধ্য দিয়া একমাত্র যাঁর অদ্বৈত সত্তার আভাস ফুটিয়া উঠিতেছে, তিনি সুখ-দুঃখ, উৎসব-হাহাকার, হরষ-বিষাদ, প্রশান্তি-উদ্বেগ প্রভৃতি বিরুদ্ধতা দিয়া ইহাকে ঢাকিয়া রাখিলেও চরম কল্যাণকেই লক্ষ্য করিয়া যে চির-কল্যাণের গড়া জগৎ চলিতেছে, একথা অস্বীকার করিতে পারি না। যাঁহার বিকাশে বিকশিত হইতেছে বলিয়া এই জগৎ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল হইয়াও অপরিবর্ত্তনীয়, সূক্ষ্ম ব্যবস্থা সমূহকে নিজ হৃৎ-স্পন্দনে ধারণ করিতেছে, তাঁহার নাম জগতের প্রতি পরিণতিকে কল্যাণতর পন্থায়ই গড়াইয়া লইয়া যায়।

ভগবানকে ডাকিতে হইলে যে জগতের হিতচিন্তায় উপেক্ষা করিয়া একমাত্র আত্মমোক্ষ লাভের লক্ষ্য লইতে হয়, এমন

স্বার্থপরের মত কথা ভুলিয়া যাইও। আজিকার যুগের তপস্বী শুধু আত্মমোক্ষের দিকে চাহিবে না, তাহাকে সেই মহামোক্ষের দিকেই দৃঢ়পদে অগ্রসর হইতে হইবে, যে মোক্ষে জগতের সকলের চরম-চরিতার্থতা রহিয়াছে। যে পরম পুরুষ ক্ষণে আমা হইতে পৃথক রহিয়া, ক্ষণে বা আমাতেই অপৃথক থাকিয়া নিত্যনবরসে আমার মানুষ-জীবনকে মধুর করিয়া তুলিতেছেন, তিনি তোমার মোক্ষ, আমার মোক্ষ এবং বিশ্বজগতের মোক্ষ বা মুখ্য লক্ষ্য স্বরূপ। তাঁহাকে যে পাইতে চাহে, জগৎকে সে না চাহিয়া পারে না ; জগৎকে যে অব্যভিচারিণী প্রেরণায় পাইতে চাহে, তিনি তার কাছ হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে পারেন না।

আমাকে আমি যখন তোমার জন্য বিলাইয়া দিলাম, তখন তোমাতে আমাতে আর পার্থক্য রহিল কোথায় ? নিজেকে জগতের জন্য বিলাইয়া আমিই জগৎ হইয়া যাই, জগৎও আমি হইয়া যায়। আবার, ভগবানের জন্য নিজেকে বিলাইয়া দিয়া, আমাতে আর তাঁহাতে যে পার্থক্যটুকু চামড়ার চোখে দেখিতে পাই, সেইটুকু খসাইয়া ফেলি বৈ ত নয় ? ভগবান যদি একান্ত-পক্ষে এই জগৎটার বাহিরে বসিয়াই ইহার সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহার বিশুদ্ধা বুদ্ধিকে ত' আর জগতের মধ্যে প্রেরণ না করিয়া পারেন নাই। সুতরাং এই জগৎটাকে ছাড়িয়া দিয়া তিনি এক পৃথক জগতে বাস করিলে আমাদের প্রাণ সেই

দূরত্বের ব্যবধানে বাঁচিবে কেন। জগৎ নিতান্তই মায়িক বলিয়া উড়াইয়া দেই কেমন করিয়া? মায়ারও যদি কোনও সার্থকতা না থাকে, তবে তিনি মায়াই বা রচিলেন কেন?

নররূপী নারায়ণ ;—মানুষই ভগবান, ভগবানই মানুষ। একই অব্যক্ত অখণ্ড মহাবস্তু অভিব্যক্তির ধারায় বহুরূপী হইয়াছেন, সুতরাং জগতের সেবা আর ভগবানের সেবা একই কথা। তুমি যখন ত্রিজগতে এক পরব্রহ্মকে ছাড়া আর কাহাকেও জানিবে না, তখনই সেবার প্রকৃত অধিকারী হইবে এবং যখন সেবাধিকারী হইবে, তখনই দেখিও, তোমা দ্বারা জগৎ-কল্যাণই হইতেছে; স্বর্গ বা মোক্ষ নয়, ঠিক্ ঠিক্ ভগবানকে যিনি চাহেন, তিনি জগৎ-কল্যাণকেই চাহেন। ঠিক্ ঠিক্ ভগবানকে ডাকিলে জগৎ-কল্যাণী চিন্তা চেষ্টা নিরপেক্ষভাবে ঠিক্ উপযুক্ত সময়টীতেই তোমাতে স্বতঃস্ফুরণে জাগিবে। আবার, ঠিক্ ঠিক্ জগৎ-কল্যাণকে চাহিলে ভগবান্ যথাযোগ্য সময়টিতে তোমার হৃদয়ে হৃদয় মিলাইবার জন্য প্রেমমধুমাখা মঙ্গল-মুরতিতে তোমার সম্মুখে আবির্ভূত হইবেন। একজনকে চাহিলে আর একজনকে পাওয়া যাইবেই ; সুতরাং ভগবানকে অথবা জগৎ-কল্যাণকে, যাহাকে খুশী, ষোল আনা প্রাণ দিয়া চাহিতে থাক। ভগবানকে শুধু ভগবানের জন্যই চাহ, জগৎ-কল্যাণকে শুধু জগৎ-কল্যাণের জন্যই চাহ। অথবা অগত্যা জগৎ-কল্যাণের জন্য ভগবানকে চাহ, ভগবানের জন্য জগৎ-কল্যাণকে চাহ।

ভগবানের জন্য ভগবান্ বা জগৎ-কল্যাণ যে কেহ তোমার উপায় হইলেও হইতে পারেন। জগৎ-কল্যাণের জন্য জগৎ-কল্যাণ বা ভগবান যে কেহ তোমার উপায় হইলেও হইতে পারেন। কিন্তু লক্ষ্যটি থাকুক এক, অদ্বিতীয়, অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তোমার দীন-কুটীরে মোহরের বস্তা বহিয়া আনিবার জন্য ভগবানকে ডাকিও না, দেশজোড়া মান-সম্মান-প্রতিপত্তির লোভে বিশ্ব-হিতকে চাহিও না। পার যদি, অবিমিশ্রা ভাগবতী বুদ্ধি লইয়া চল ; পার যদি. সুবিশুদ্ধা বিশ্বহিতৈষণা লইয়া অগ্রসর হও,—গোপন প্রার্থনাপুঞ্জের ক্লেশবহ গুরুভার স্কন্ধোপরি তুলিয়া লইয়া সামর্থ্যকে অপচিত এবং কর্ম্মের পবিত্রতাকে কলুষিত করিও না।

যখন জগতের হিতচিন্তা জাগিবে, তখন জানিবে, এখন এই চিন্তারই সময়। যখন ভগবানকে স্মরণ হইবে, তখন জানিবে, এখন ভগবানেরই নাম জপ, কীর্ত্তন বা অনুধ্যানের সময়। উৎসর্গ করিতে যাহারা কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে, নিশ্চিত জানিবে, তাহাদের পা কখনও বেতালে পড়ে না, পড়িতে পারে না। তোমার জীবন-লীলার মধ্য দিয়া শ্রীভগবানেরই নিত্য-লীলার বিকাশ, তোমার চরণ-ভঙ্গীতে ভুল নাই, ভুল থাকিতে পারে না। যে মুহূর্ত্তে তুমি নিজেকে ভগবানের জানিয়াছ, ভগবানকে তোমার জানিয়াছ, সেই মুহূর্ত্তে তোমার কর্ম্মাকর্ম্ম, শুভাশুভ শ্রীভগবানেরই আত্মস্ফুর্ত্তির পর্য্যায়-সমূহ বলিয়া গণিত হইয়া

গিয়াছে। তোমার কর্ম্মে মিথ্যা থাকিতে পারে না, তোমার প্রসারে সঙ্কোচ আসিতে পারে না। ভগবানকে চাহিবামাত্রই তুমি নিত্য-নির্ভুলের পথে চলিয়াছ।

সাধকেরা বলিয়াছেন,—"নাম ও নামী অভেদ।" নামের সেবাতে ভগবানের সেবা হয়; নামের শক্তিতে ভগবানের শক্তি রহিয়াছে। শাস্ত্রকারগণ ব্যাখ্যার পর ব্যাখ্যা করিয়াও যেমন ভগবানের স্বরূপ-বর্ণন করিতে পারেন নাই, তাঁর "অবাঙ্‌মনস-গোচর" মহিমার কথা কহিতে কহিতে যেমন ভাষার দৈন্য বুঝিয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছেন, তাঁর নামের মহিমা বলিতেও সকলেই তেমন অক্ষম হইয়াছেন। নামের সেবায় একনিষ্ঠ হইলে, কয় ঝুড়ি সোণা পাওয়া যায়, কয় গাড়ী মান-যশ মিলে, সে সংবাদ আমি বলিতে পারিব না। কিন্তু আমি জানি, নাম-সেবাদ্বারাই মানুষ নামের যথার্থ মাহাত্ম্য অবগত হইতে পারে এবং তৎপরবর্ত্তী অবশ্যম্ভাবী উন্নত অবস্থা-নিচয়ে নিত্যকাল নির্বিঘ্নে অবস্থান করিতে পারে। আমার মুখে শুনিতে না চাহিয়া, ভগবানের নামের নিজ মুখে শুনিতে উৎকর্ণ হও, নিশ্চিত তুমি শুনিবার মত শুনিতে পাইবে। সূর্য্যতেজের ন্যায় নামের মাহাত্ম্য স্বতঃপ্রকাশ, উহা নিজেই বুঝিবে, শুধু বুঝিবার জন্য আগ্রহী হও। যে যাহা চায়, সে তাহা পায়।

শক্তি-সঞ্চয়ের শ্রেষ্ঠ উপায়, সর্ব্বশক্তিমানের মধ্যে সর্ব্বদা চিত্তকে ডুবাইয়া রাখা। বাক্যকে নয়, চিত্তকে ডুবাইতে

হইবে। বাক্যের আস্ফালনে কবিত্ব, চাই-কি কখনও কখনও বীরত্বও হইতে পারে, কিন্তু তপস্যা হয় না। তপস্যার প্রাণ অকাপট্য। চিত্তকে আদর্শের দিকে প্রেরণ কর, দেহকে আদর্শের অনুগামী কর। আদর্শ যখন হইবে অফুরন্ত, উহা লাভের প্রয়াসের সাথে সাথে শক্তিও জাগিবে অফুরন্ত। উৎসাহী হও, বিশ্বাস কর,—বিশ্বতোমুখিনী শক্তি-প্রবাহিনী তোমার মধ্যে সাগর-সঙ্গম খুঁজিয়া লইবে।

হে পুত্র, বিশ্বাস কর, ভগবানের জন্য, জগতের জন্য, নিজহস্তে কণ্ঠনালী ছিঁড়িয়া দিবার ক্ষমতা তোমার আছে। বিশ্বাস কর, বুকের উপরে 'ডিনামাইট' দেখিয়াও নিঃস্পন্দিত হৃদয়ে জগৎ-কল্যাণ করিবার সামর্থ্য তোমার আছে। বিশ্বাস কর, মাথার উপরে বজ্রাঘাত সহিয়াও তোমার চিন্তা ও বুদ্ধির ধারা কখনও আত্মসুখপরায়ণ বা বা আত্মরক্ষা-লোলুপ হইতে পারে না,—তোমার সর্ব্বস্ব একমাত্র জগতের জন্য। বিশ্বাস কর, আধি-ব্যাধি ও বিধিদুর্দ্দৈব সব কিছু অগ্রাহ্য করিয়া সবল পদক্ষেপে অগ্রণী হইবার চলিষ্ণুতা তোমার চরণযুগে আছে। বিশ্বাস তোমাকে শক্তি দিবে, বিশ্বাস তোমাকে বীর্য্যবান করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

আপনার জন

পঞ্চবিংশ পত্র

২১ ফাল্গুন, ১৩৩০

পরম স্নেহের—,

জগতের লোকের কাছে নাম যশ লাভ করাই একটা পুরুষার্থ নহে, স্বার্থলেশমাত্রহীন হইয়া দৃঢ় বিক্রমে জগতের সেবায় আত্মবিসর্জ্জন করাই পরম পুরুষার্থ। অকপট সেবার সৌভাগ্যেই ত্যাগীর লক্ষ্য, কল-কোলাহলময়ী লোক-প্রশংসা কখনও তাহার লক্ষ্য হইতে পারে না। আত্মগঠনে তৎপর এবং জীবসেবায় অগ্রসর হইলে যুগপৎ নিন্দা-প্রশংসা বর্ষার বারি-ধারার মত বর্ষিত হইতে থাকিবেই। প্রশংসা-লিপ্সুর নিন্দার হাত হইতে পরিত্রাণ নাই, কিন্তু যথার্থ কর্ম্মী নিন্দা-প্রশংসার অতীত।

কি করিলে জগতের লোকের কাছে তোমার পরিচয় হইবে, কি করিলে সকলে তোমাকে চিনিবে, সে সকল বাজে চিন্তা ছাড়িয়া দাও। ঐ সকল তুচ্ছ চিন্তা একেবারে তুচ্ছ না হইলেও, তোমার জীবনের উপর হইতে উহাদের প্রভাব তিরো-হিত হউক। যাহারা জগতের ব্যথায় ব্যথিত হইতে শিখে নাই, হৃদয়কে সহানুভূতিশীল করিতে পারে নাই, নামযশের দুর্নিবার লোভ তাহাদিগকে জগদ্ধিতের পথে টানিয়া আনে। কিন্তু উহা সাধনে সহায় হইলেও সিদ্ধিতে বিঘ্ন। যাহা নিম্নাধিকারীর জন্য ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, সর্ব্বস্ব ত্যাগে সঙ্কল্প-বান্ হইয়াও তুমি তাহার জন্য লালায়িত থাকিবে কেন বাছা?

নিজেকে তুচ্ছ নাম-যশের ঊর্দ্ধে জানিয়া শুধু সাধনপর হও। প্রতি শ্বাসে, প্রতি প্রশ্বাসে নিজেকে অক্ষয়, অমর, অব্যয়, অদ্বিতীয়, অখণ্ড পরমাত্মাস্বরূপ জানিয়া আত্ম-সমাহিত হও। আত্মস্থ নিস্তব্ধতার মৃত্যুঞ্জয়ী পরাক্রমে বিশ্ব-জগতের স্বার্থ-কোলাহলকে পরাস্ত কর। নিজেকে বিশ্বের প্রতি অণুপরমাণুতে আর বিশ্বকে নিজেতে ওতঃপ্রোতভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া কুল পবিত্র কর, জননীকে কৃতার্থা কর, উপদেষ্টাকে ধন্য কর। পিপাসিত জগতের নিখিল পিপাসার শান্তি বিধান করিয়া নিজেও তৃপ্ত হও, শান্ত হও।

প্রশংসাটাই বড় নয়, যথার্থ মানুষটাই বড়। মানুষের মত মানুষ হইতে পারিলে তোমার পদ-নখ-বিচ্ছুরিত কিরণচ্ছটার জলন্ত গরিমা বর্ণনা করিয়া উঠিতে ব্রহ্মাণ্ডের সকল চারণেরা শত যুগ ধরিয়া পারিবে না। মরিতেই যে সঙ্কল্প করিয়াছে, অমরত্ব-প্রাপ্তির তার আর বিলম্ব কি আছে? একটা মানুষ অমর হইলে, কোটি কণ্ঠে তাঁরই বন্দনা-গীতি সমুত্থিত হয়, তার প্রশাস্তি ভাষণে প্রত্যেকটি মানুষ শতমুখ স্বতঃই হয়,—ইহার জন্য বিজ্ঞাপন ছাপাইতে হয় না। কারণ, সূর্য্য যে স্বমহিমায় উজ্জ্বল, একথা কেহ না বলিয়া দিলেও সবাই বোঝে।

ফুল না ফুটিতে কি ভ্রমর গুঞ্জন করে রে? বসন্তের মলয়ানিল-লহরী না বহিতে কি কোকিলা-কুল কুহরে রে? সন্তান

জঠরে না ধরিলে যে মায়ের স্তনেও দুধ আসে না!—আজ তোমাতে প্রস্ফুটন চাই, আজ তোমাতে বসন্ত চাই, আজ তোমাতে জগৎ-কল্যাণ-প্রসবিনী কঠোর সহিষ্ণুতা চাই। তাহা হইলেই জগৎ তোমাকে না চিনিয়াও চিনিতে বাধ্য হইবে। নতুবা চিনিয়াও যে চিনিবে না! তোমার উৎসর্গ-প্রেরিত জীবন মুখ্যতঃ এবং গৌণতঃ একমাত্র বিশ্ববাসীর সেবাকে চাহিলে, তোমাকে প্রশংসা করিবার লোক ঢের মিলিবে, তোমার গুণ-গুঞ্জন করিয়া কত জনে উদ্ধার পাইবে। কিন্তু বাবা, মানুষকে প্রশংসা দিয়া বড় করা যায় না, প্রশংসাই মানুষকে দিয়া বড় হয়। তুমি তোমার সম্ভাবিত যশস্বিতা অপেক্ষা কোটি গুণ বড় হও, আমার এই প্রার্থনা।

আকাঙ্ক্ষা নেকী, স্বার্থদুষ্ট, ক্ষণচঞ্চল ও ক্ষণবিলয়ী না হইলে মহাপুরুষগণের কৃপা এবং ভগবানের কৃপা তোমাকে নিশ্চিতই বড় করিবে। ভোগসুখের কাঙ্গাল-মানুষ দু-দশ-বিঘা জমির মালিক হইয়া অথবা দু-চার গণ্ডা কড়ির মালিক হইয়া যে কৃপা করিতে পারে, তাহা দাতার ঘরেই পাপে ও দুর্নীতিতে অন্যায়ে ও ব্যভিচারে অভিসম্পাত-তুল্য হইয়া রহিয়াছে, সুতরাং উহা ব্যর্থ। কিন্তু পরার্থে আত্মত্যাগী শ্রীভগবানেরই কৃপাবলে নিজে কৃপাময় হইয়া অখণ্ডের ঘরের কোষাধ্যক্ষ হইয়া বসিয়া আছেন, তাই তাঁহাদের কৃপা পরমশ্লাঘ্য বস্তু। জাতি-বর্ণ-সমাজ-বিচারে—না মাতিয়া, জন্মোত্তিহাসের বাস্তবতার ব্যাখ্যা—অপব্যাখ্যায়

মন না দিয়া, ছোট-বড়-নির্দ্দেশে সমালোচনা না করিয়া, যেখানে যে-ভাবে যে-যুগের ত্যাগীর স্পর্শ মনে, ধ্যানে, বা স্মৃতিতে লাভ করিবে, তখনই সেখানে মাথা নত করিয়া শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দিবে। যথার্থ বড় হওয়ার ইহাই সঙ্কেত। বড়র পায়ে মাথা নত করিলে সহজে তাঁর কৃপা হয়, অর্থাৎ তাঁর সদ্‌গুণ, তাঁর মহত্ত্ব, তাঁর অপার্থিব জীবনাদর্শ সহজে আয়ত্ত হইয়া যায়। বশিষ্ঠের পায়ে এই জন্যই শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বামিত্র মাথা নত করিয়াছিলেন। তোমার আদর্শ ব্রাহ্মণ্য। আচণ্ডাল-ব্রাহ্মণে ইতর-বিশেষের লোক-প্রথা অগ্রাহ্য করিয়া যাহা তপস্যার অরণী-ঘর্ষণে প্রদীপ্ত প্রভায় জ্বলিয়া উঠে, সেই ব্রাহ্মণ্য। তোমার কাছে ত্যাগীর জন্য জাতি-বিচার বর্ণ-বিচার থাকিবে না। যেখানে যাহাকে দেখিবে ত্যাগী, তাহাকেই পূজনীয় বলিয়া স্বীকার কর।

জ্ঞানের অসি করে ধারণ না করিলে সংসার-সমর-ক্ষেত্রে পরাভব অপরিহার্য্য। এই অসি একবার হাতে পাইলে সূর্য্য-করোজ্জ্বলা পৌরুষ-প্রভা ঝক্‌ঝক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে। কিন্তু "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" ।—উহা ক্লীব-কাপুরুষ, ভীরু-দুর্ব্বলের হাতে ধরা পড়ে না। শক্ত লোকের শক্ত হাত চাই। হায়, হায়, কতজন জ্ঞান-অসি করে ধারণ করিতে যাইয়া শুধু অজ্ঞানেরই আস্ফালন করিয়া মরিতেছে।

বীর হও, মহাবীর হও, বিশ্ব-সন্ত্রাসী মহাবীর্য্যের আধার হও, সকল অসত্য তোমার ভৈরব-মূর্ত্তি দেখিয়াই দূর হইতে পলায়ন করিবে। সত্য কখনও সন্ত্রস্ত হয় না, সে তোমার তাণ্ডব-নর্ত্তনের প্রলয়-ছন্দ বাহিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া তোমার কণ্ঠবিলম্বী মণিময় হার হইয়া রহিবে। সত্য অসত্যপন্থীর ফণী, সত্য-সন্ধের পরশমণি। যে সহস্রশীর্ষ ফণীর আক্রুষ্ট গর্জ্জনে জগতের কোটি স্বার্থান্ধ, মদান্ধ, কামান্ধ মানব দূর হইতে দূরান্তরে পলাইতে গিয়া অসত্যের গভীর গহ্বরে পতিত হইয়া নিরবধি হাহাকার করিতেছে, সকল স্বার্থবোধ পায়ের তলায় পিষিয়া ফেলিয়া সেই অনন্ত-নাগের শীতল বক্ষেই তোমার শেষ শয়ন রচিয়া লও এবং আত্মস্থ চৈতন্যের অমৃতময়ী শক্তিতে অধোগত মানব-সন্তান-নিবহের উদ্ধার সাধন কর। মরুভূমিতে নন্দনোদ্যান সৃষ্টি কর, নিজের বুকের অজস্র শোণিত-ধারায় এই নন্দনের অশোক-পারিজাতের পল্লবে পল্লবে অভিনব সুষমার বসন্ত-যৌবন রচিয়া দিয়া কৃতার্থ হও, কৃতার্থ কর। ইতি—আশীর্ব্বাদক

তোমার আপনার জন

ষড়্‌বিংশ পত্র

১১ই চৈত্র,

স্নেহের—, (১৩৩০)

* * * যে মহানাম লাভ করিয়াছ, তাহাকেই ভেলাস্বরূপ জান। তাহা অবলম্বনেই সংশয়-সাগরের পরপারে পৌঁছিবে।

দৃঢ় চিত্তে তেলাবলম্বন কর। তরঙ্গ-বিক্ষোভে টলিয়া পড়িও না। নামের বলে তোমাদের মধ্যে মহাশক্তি ও মহাভাব জাগিয়া উঠিবে। সেই মহাভাবের প্রচার এবং প্রসারের দ্বারা তোমরা জগতের বিষ-বাষ্প-সমাচ্ছন্ন হিংসা-দ্বেষ-সমাকুল আকাশে-বাতাসে এক প্রবল ঝঞ্ঝা বহাইয়া দিয়া দিঙ্‌মণ্ডল পরিষ্কার করিয়া দিবে। ইহাই তোমাদের কাজ।

আমার দিকে চাহিও না। আজ কথা কহিতেছি, কাল চুপ মারিতে পারি। * * * পথে যখন নামিয়াছ, পশ্চাদ্-দৃষ্টি রুদ্ধ কর, অনন্ত সম্মুখেই দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দাও। মরিলেও আর ফিরিবে না, সঙ্কল্প সাধন না করিয়া ছাড়িবে না,—এই জিদ্ কর। * * * যাহা আমি একটী দেহ ও একটী মন দিয়া করিতাম, তোমরা তাহা শত জনে শত দেহ লইয়া শত মন লইয়া কর। সুমহান্ ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা কর, অসত্যের সহিত দুর্ব্বার সংগ্রামে নিত্য নূতন সাম্রাজ্য জয় কর।

নিবিড় তপস্যার অগোচর গুহা হইতে ভাবের অভ্যুদয় হয়, মানব-জীবনের ছোট-বড় কর্ম্মচেষ্টায় এবং তদ্বিষয়িনী আলোচনায় উহার পরিপুষ্টি ও প্রসার হয়। ভারতের লক্ষ কোটি গুপ্ত গুহার তপস্যা এখনও প্রচার পায় নাই, তোমাদিগকে উহা প্রচারিত করিতে হইবে। অপরিমেয় জাতীয় সম্পদ এখনও কত বৃক্ষ-কোটরে কত বালুকা-বিস্তারে প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, তোমরা তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবে এবং জাতি-বর্ণের বিচার না মানিয়া

নিরপেক্ষভাবে সকলের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবে। এই গুরুভার-দায় তোমাদেরই স্কন্ধে ন্যস্ত রহিয়াছে। কিন্তু নিজেদের ভিতরে তপঃশক্তির অন্ততঃ প্রাথমিক উন্মেষটুকুও না ঘটিলে গুপ্তধন লাভের কোন যোগ্যতাই জন্মিবে না, তুমি আবার কাহাকে কি বিতরণ করিবে? শূন্য হস্তে দাতৃত্বের অভিনয় যে বড়ই বিড়ম্বনা! মনের সকল বিক্ষিপ্ততাকে দূর করিয়া, আবেগাকুল ভোগাকাঙ্ক্ষাকে সুসংযত করিয়া, ইন্দ্রিয়ের শতমুখ প্রলোভনকে পরাজিত করিয়া, আত্মসুখের নির্লজ্জ অভিযানকে পর্যুদস্ত করিয়া দিয়া, এক আদর্শ এক লক্ষ্য ধরিয়া চলিলে, একই উদ্দেশ্যের পরিসমাপ্তিকল্পে দেহের ও মনের সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিলে, তবে তোমাতে তপঃশক্তির অঙ্কুর গজাইবে। চাই একাগ্রতা ও একনিষ্ঠা, চাই মৃত্যুপণ করিয়া প্রযত্ন। তবে তুমি নিজে জ্ঞান লাভ করিবে, পরকে জ্ঞান দিতে পারিবে।

তপস্বীর কথাই কথা, উচ্ছ্বাস না থাকিলেও উহাতে সুপ্ত শক্তির উদ্বোধন হয়, উত্তেজনা না থাকিলেও উহাতে বিদ্যুৎ-প্রেরণা জাগ্রত হয়। কারণ, তপস্বীর কথা অনুভূতি-সিদ্ধ, ভাব-যোগে নিত্য-প্রত্যক্ষ, অতএব অকাট্য। মানুষের প্রাণ জাগাইতে কবিত্ব চাই না, চাই প্রাণবত্তা। কথার মাঝে যতটুকু প্রাণ ঢালিয়া দিতে শিখিয়াছ, নিশ্চিত জানিও, ততটুকুই তুমি মানুষের প্রাণ জাগাইয়া দিয়াছ। অকপট ভাবই প্রকৃত ভাব, কপটের ভাব অ-ভাবেরই নামান্তর মাত্র। ভাবই মনুষ্য-সমাজের

সংগঠনী ও সম্মিলনী শক্তিটুকুকে ধরিয়া রাখিয়াছে, ভাবের বৈচিত্র্যই সমাজের অঙ্গে অঙ্গে অপূর্ব্ব বিচিত্রতার রেখাপাত করিয়া দিয়াছে। ভাবই মানুষকে ত্যাগী করিয়াছে, সংযমী করিয়াছে, পরার্থে সর্ব্বস্ব-উৎসর্গকারী সন্ন্যাসী করিয়াছে। আদান-প্রদানের নিয়ম অনুসরণ করিয়া নয়, হিসাব-নিকাশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খতাইয়া নয়, যুক্তি-বিচার-বিতর্কের অকুরন্ত জের টানিয়া নয়, একমাত্র ভাবের বলেই মানুষ যুগে যুগে দেশকে ভাল বাসিয়াছে, জাতিকে ভাল বাসিয়াছে, জগৎকে ভাল বাসিয়াছে, ধর্ম্মকে ভাল বাসিয়াছে এবং ভালবাসার বস্তুর জন্য অবহেলে কাঁচা মাথা নিজ হাতে কাটিয়া দিয়াছে।

যেখানে কাপট্য নাই, পাটোয়ারী বুদ্ধি নাই, জিলাপির পাঁচ নাই, সেখানে ভাব বিশ্বজয়ী। তোমরা আলেকজান্দার, সীজার বা তৈমুরের অপেক্ষা বড় দিগ্বিজয় করিতে বাহির হইয়াছ,— তোমাদের ঢাল-বর্ম্ম, তীর-ধনুক সবই ঐ একমাত্র ভাব। যোদ্ধার অসিতে মরিচা ধরিলে তার কি আর যুদ্ধজয় হয়? ভাবের মধ্যে ব্যবসায়ী বুদ্ধি থাকিলে, জ্ঞান-প্রচারে স্বার্থের কলঙ্ক পড়িলে, তোমার বিজয়-লাভও তেমনই সুদূর পরাহত। পেশাদারী বক্তার সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতাও ব্যর্থ হইবারই জন্য, একান্ত-চিত্তের যুক্তিলেশ-বর্জ্জিত তাণ্ডব-চীৎকারও সাফল্য পাইবার জন্য। সরলতাই ভাবের বিশুদ্ধতা রক্ষা করে এবং তাহার

মেরুদণ্ডে শক্তির সঞ্চার করে। তোমাদিগকে এই কথাটুকু মনে রাখিতেই হইবে।

তানসেনের তানানুকার করিতে যাইয়া আজ কি ভাবের আসরে শত শত মানুষের সন্ধান কেবল রাসভ-রাগই বিস্তারিত করিতেছে না? ইহার একমাত্র কারণ, ভাবের উপরে স্বার্থের প্রভাব। যাহাকে তোমরা সাহিত্য বলিয়া প্রশংসা করিতেছ, শত শত স্থলে তাহা যথার্থ সাহিত্যের ব্যর্থ অনুকরণ মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। মানব-জীবনের মধ্য দিয়া যে অন্তঃসলিলা বিপ্লব-ধারা তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে, এই সাহিত্য তাহার কোনও সন্ধান রাখিতেছে না। আবার, একটা ঝড়ের অপেক্ষা করিয়া ধরণী যে শান্ত স্থির গম্ভীর হইয়া বসিয়া আছে, তাহাও ইহার লক্ষ্যে পড়িতেছে না। যেখানে অবস্থা পারম্পর্য্যের ও সূক্ষ্ম কার্য্যকারণ-সম্বন্ধের পরিপূর্ণ অনুভূতি নাই এবং অন্তর্দৃষ্টি নাই, সেখানে সাহিত্য ঠিক ঠিক সাহিত্য নহে।

সাহিত্য-সাধনা ভাবের সাধনা, শব্দের সাধনা নহে। চর্ম্ম-চক্ষে যেখানে শত শত ব্যবধানের দেয়াল দেখিয়া ছোট-বড়র, ধনী-কাঙ্গালের পার্থক্য সৃষ্টি করি, অন্তর্দৃষ্টিবলে সেখানে সকল পার্থক্য-বোধকে অপসৃত করিয়া এক সুমহান সাম্যভাব, এক অপরূপ একাবদ্ধতা দর্শন এবং অনুভূতিবলে তাহা উপলব্ধি

কথার নামই সাহিত্য-সাধনা। ভাবের সাধনা ভাষায় ফুটিয়া ওঠে, ভাবের প্রগাঢ়তা ভাষার মাধুরী রচনা করে। রক্তমাংসের ক্ষুধার কথা, পূতিগন্ধময় আবর্জনা স্তূপের কথা সাহিত্য সৃষ্টি করে না, কারণ, উহাতে আমি এবং আমার ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধ তথাকথিত তৃপ্তিই প্রধান, উহাতে সর্বজনীন ও সার্বভৌমিক পরিতৃপ্তিমূলক ভাবের সাধনা নাই। মানুষে মানুষে জীবে জীবে যখন ভাবের দিক্ হইতে যথার্থ সাম্যবোধ জাগে, তখন মানুষের পশুত্বের দিকটা মরিয়া যায়, তাহার চিরন্তন দেবত্বই দেদীপ্যমান হইয়া উঠে। তাই তখন সাহিত্যিকের কল্পনা দুঃখের মহিমা কীর্তন করিতে সহস্রমুখ হইয়া পড়ে; দুঃখ, দৈন্য, অত্যাচার, উৎপীড়ন, ইহাদেরই মধ্য দিয়া দেবশক্তি গর্জিয়া উঠে। ঐহিক শক্তির উপরেও যে উচ্চতর নিয়ন্ত্রী শক্তি রহিয়াছে, ঐ গর্জনে মোহান্ধ জগৎ তখন তাহা বিশ্বাস করিতে বাধ্য হয়। মানুষের প্রতিভা যাঁহার প্রতিভার তুলনায় তুচ্ছাতিতুচ্ছ, মানুষের শক্তি-সামর্থ্য যাঁহার কটাক্ষমাত্রের কাছে নিতান্ত নিষ্প্রভ, মানুষ তখন সেই পরমপুরুষের শান্তিময় ক্রোড়ে ছুটিয়া যাইতে চাহে। ভোগ-বিলাসের সুখ-শয্যায় শান্তি না চাহিয়া ইন্দ্রিয়বিকারের পঙ্ক-মধ্যে আশ্রয় না খুঁজিয়া ভগবানের কোলে শান্তি ও আশ্রয় পাইবার জন্য মানুষ যে আকুল হয়, এই আকুলতাই সাহিত্যকে সার্থক করে। যে সাহিত্য এই আকুলতাকে জাগ্রত করে না, তাহা সাহিত্য-পদ-বাচ্য নহে।

জীবনের প্রতি কর্ম্মে তোমরা অকাপট্যের উপাসক হও। সুখে, দুঃখে সমভাবে কায়মনোবাক্যে সরল থাক এবং কপটতা-পূর্ণ জগতের নিজ-চেষ্টা-প্রসূত সকল অকল্যাণকে বাহুবলে অর্থাৎ তপঃশক্তিতে উৎপাটিত ও নিহত কর। শুভাশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
আপনার জন

সপ্তবিংশ পত্র

প্রেমাস্পদেষু,—

জান কি ভাই, এই জগৎ জুড়িয়া কত অকল্যাণ আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত শৈথিল্য ও অসাবধানতার সুযোগ পাইয়া আত্মপ্রসার বাড়াইয়া লইয়াছে? জান কি, কত ব্যথা দুঃখ এই জীর্ণ, স্থবির জাতিটার উপরই বা সমুদ্রের তরঙ্গের মত আছাড়িয়া পড়িয়া ধ্বংসের প্রলয়-ছন্দে ছুটিয়া চলিয়াছে? মানুষের মুখস পরিয়া কামকাতর কুক্কুরের জীবনযাপন করিয়া আমরা যে আজ রসাতলে চলিয়াছি। আজ কি তোমার কল্যাণ-হস্তের শীতল স্পর্শে এই মরণোন্মুখ জাতিকে আশ্বস্ত করিবে না?

মানুষের বংশধর হইয়া আজ ক্লীবের মত উদাসীন জীবন-যাপন করিবার অধিকার যে তোমার নাই, প্রতিদিন প্রতিক্ষণে,

দিবারাত্রি, সবসময়ে তাহা চিন্তা করিও। জগতের সকলের কাছ হইতে যে কাতর প্রার্থনা অশরীরী আকৃতি ধরিয়া প্রতি-নিয়ত আসিতেছে, তাহা যেন তোমার কাছ হইতে ব্যর্থতার অরুন্তুদ দুঃখ ও মর্ম্মযাতনা পাইয়া ফিরিয়া না যায়।

মানুষ তুমি, আজ মানুষের অবনতি দেখিয়া কেমনে চুপ করিয়া থাকিবে? পুরুষ তুমি, পৌরুষের বিপর্য্যয় দেখিয়া কেমনে নীরব রহিবে? আজ তোমাকে আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে, আজ তোমাকে জীবন বলি দিতে হইবে। একটা আবেগের মুখে নয়, হুজুগের তোড়ে নয়, প্রতিমুহূর্ত্তে তিল তিল করিয়া নিজেকে সমর্পণ করিতে হইবে এবং আত্মসমর্পণের প্রতি অংশে নিজের দুঃখকে সুখদুঃখাতীত নির্দ্বন্দ্ব আনন্দের মূর্ত্তি বলিয়া বরণ করিতে হইবে।

কিন্তু ইহা ত' সোজা কথা নয়। অণুপরমাণু করিয়া আত্ম-বলি দিতে সংযম চাই, ব্রহ্মচর্য্য চাই, সর্ব্বোপরি অধ্যাত্ম-সাধনের অটুট একাগ্রতা চাই। নতুবা পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘন হয় না। হাত-পা বাঁধিয়া সাঁতার দিতে সেই জানে, যে বিশ্বাস করে, সকল সমুদ্রেরই শ্রেষ্ঠ নৌকা শ্রীভগবানের নাম। নামের মধ্য দিয়াই তৃণখণ্ডে হিমাচলের গুরুত্ব, হিমানীখণ্ডে সূর্য্যের তেজস্বিতা এবং কাঁচখণ্ডে ইস্পাতের সহনশীলতা সংক্রামিত হয়। নামের পূর্ণতায় জগতের সর্ব্বব্যক্তির, সর্ব্ববস্তুর, সর্ব্ব অবস্থার

অপূর্ণতা দূরীভূত হয়। সুতরাং নামের অমৃত-রস আস্বাদনের জন্য আজ উন্মুখ হও, ব্যগ্র হও।

নামের মধু যে কি মধু, তাহা বুঝাইবার শক্তি কার আছে? নিজে আস্বাদন না করিলে তোমাকে কেবল বাক্যের দ্বারা তাহা দিতে পারে, এমন সাধ্যই বা কার আছে? নামে যে কত মধু সঞ্চিত, তাহা বুঝিবার জন্য আজ তোমাকেই বিজন পথে গোপন-পদসঞ্চারে চলিতে হইবে। নাম আত্মারাম সামগ্রী, উহা হাটে বাজারে লভ্য নয়, বিজ্ঞাপন ছড়াইয়া সাইনবোর্ড টানাইয়া বেসাতী করার জিনিষ উহা নয়। উহার সাধনে গোপনতা চাই, কারণ, গভীরতা গোপনতা ছাড়া আসে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

আপনার জন।

অষ্টাবিংশ পত্র

৭ই বৈশাখ,

১৩৩১

কল্যাণবরেষু :—

হে পুত্র, ক্ষুধিত আতুর যেমন করিয়া ধনীর দুয়ারে তাকাইয়া থাকে, আমি তোমাদের মুখপানে তেমনি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছি। তোমাদের জীবন পরার্থে উৎসর্গীকৃত হইয়া যেদিন তপঃশুদ্ধ হইবে, হে সন্তান, সেই দিনই তোমরা আমার ক্ষুধা-

তৃষ্ণা যথার্থ মিটাইতে পারিবে। স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিহীন, সুখের প্রতি লক্ষ্যহীন, বিঘ্নের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন জীবন লইয়া যে দিন তোমরা মায়ের ক্রোড় জুড়িয়া বসিবে, প্রকৃতই সেদিন আমার সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইবে। যেদিন উদ্বেলিত মনোবৃত্তির কোলাহলে কর্ণপাত করিবে না, যেদিন সংগ্রামবহুল কর্ম্মক্ষেত্রে ভয়বশে পিছাইয়া আসিবে না, যেদিন শত দুঃখ-কষ্টে পীড়িত হইয়াও মানবজীবনের পরম চরিতার্থতার পন্থাকে নিরর্থক কৃচ্ছ্র-সাধন বলিয়া মনে করিবে না, সেদিন তুমি আমার সর্ব্বাঙ্গ শীতল করিবে, মনে প্রাণে, অকপট আগ্রহে যেদিন জগতের মঙ্গলকে চাহিবে, সেইদিনই তুমি আমার হৃদয় জুড়াইবে।

মানুষের মত মানুষ হইবে বলিয়া তুমি যে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়াছ, শ্রীপ্রভুর শুভেচ্ছা ও আশীর্ব্বাদে তাহা অভিষিক্ত হইবে। মহাজনগণের চরণ-চিহ্ন অনুসরণ করিয়া তোমাদের জীবনে তাঁহাদের সমকক্ষ অথবা ততোধিক মহিমাময় গৌরব প্রতিষ্ঠিত হউক। পরার্থে সর্ব্বত্যাগে তুমি তাঁহাদের পবিত্র পদাঙ্কের অনুগমন করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হও। তোমার স্বার্থ-লেশহীন আত্মোৎসর্গ পরবর্ত্তিগণের জন্য সমুচ্চ আলোকস্তম্ভ-স্বরূপে দেদীপ্যমান রহুক। তোমার ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে সদাত্মারা যে সকল আশার বাণী শুনাইয়াছেন, তাহা সহস্র-গুণিত হইয়া তোমার জীবনের কর্ম্মে সত্য হউক এবং লক্ষগুণিত হইয়া মোহমুগ্ধ স্বার্থলুব্ধ লক্ষ্যহীন মানব-চিত্তের উপরে প্রভাব

বিস্তার করুক। কাজের মত কাজ করিয়া নামের মত নাম রাখিয়া যাও। যে নাম শুনিলে ভগবানের অভয়হস্ত প্রসারিত দেখিতে পাওয়া যায়, যে নামটী মনে থাকিলে পাপের পিচ্ছিল পথে চলিতে চলিতে কামুক লম্পট সহসা নবশক্তির উন্মেষ পাইয়া ফিরিয়া দাঁড়ায়, তোমার নামটীর মধ্যে তেমন এক জ্যোৎস্নামাখা প্রেম এবং বজ্রাগ্নি-মাখা তপস্যার স্মৃতি জড়াইয়া রাখ। মন্ত্রশক্তিতে যেমন ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গম মাথা নত করে, বিকট-দর্শন প্রেত-মূর্ত্তি আকাশে মিলাইয়া যায়, যে নামটী দিয়া জগতের কাছে তুমি পরিচিত হইতেছ, সেই নামটীর মধ্যেও তেমন অব্যর্থ শক্তির সঞ্চার কর। মৌন সাধনের প্রচ্ছন্ন মহাবীর্য্য দিয়া ইহাকে ভরপূর কর। অকপট অক্লান্ত তপঃসাধনের বলে প্রতি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে সহস্র ব্রহ্মাণ্ডের উত্থান-পতন লক্ষ্য করিয়া আজ আত্মস্থ হও এবং আত্মস্থ নিত্যচৈতন্যের পরিপূর্ণ আশ্বাস পাইয়া সমগ্র জগৎকে তাহা লাভ করাও।

যাঁহার উপরে নির্ভর করিয়াছ, তাঁহার উপরে আরও নির্ভরশীল হও। যাঁহাকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছ, তাঁহাতে নিজেকেও নিঃশেষে সমর্পণ কর। যাঁহাকে ভালবাসিয়া জীবনে নবযৌবনের বিকাশ পাইয়াছ, তনু-মন দিয়া ভাষা ও আশা দিয়া, কর্ম্ম ও মর্ম্ম দিয়া একমাত্র তাঁহাকেই ভালবাস। যাঁহার দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছ, তিনি কাহাকেও ফিরাইয়া দেন না। প্রকৃতই যদি তাঁহাকে চাহ, না বুঝিয়া দুই চারিটা দোষ করিলে

তিনি রোষ করিবেন না। জগতের সংগ্রামমুখর কর্ম্মক্ষেত্রে জগৎ-কল্যাণে যুদ্ধ করিতে যাইয়া রুধির-বসা-লিপ্ত ধূলিপঙ্ক অঙ্গে লাগিলে তিনি অধম পামর বলিয়া উপেক্ষা করিবেন না। যিনি হৃদয়ের স্বামী, তাঁহারই মহিমা প্রচার করিতে কলকণ্ঠ হও, সমগ্র বিদ্রোহী চিত্তবৃত্তি কোলাহল পরিহার করিয়া নিমেষে নীরব হইয়া যাইবে, চিরপ্রার্থিত তাঁর চরণে ঠাঁই দিবেন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

আপনার জন

ঊনত্রিংশ পত্র

৯ই জ্যৈষ্ঠ,

১৩৩১

কল্যাণবরেষু,—

* * * দুঃখদুর্গতি না থাকিলে কখনই মানুষ পরিপূর্ণ জীবন লাভ করিতে পারিত না। মাঝে মাঝে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন না হইলে সূর্য্যরশ্মির ও কদর থাকিত না।

পাণ্ডবজননী কুন্তী চিরদুঃখই চাহিয়াছিলেন, কারণ, যখন মানুষ নিজের সীমাবদ্ধ জীবনের অক্ষমতাসমূহ স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারে, শুধু তখনই শ্রীভগবানের চরণে লুটাইয়া পড়ে। অতটুকু অভিমান থাকিতেও মানুষ মনের কোণে ভগবানকে

স্থান দিতে চাহে না। তাই অনুক্ষণ তাঁহাকে মনে রাখিবার জন্য, মর্ম্মে মর্ম্মে তাঁহার নামের মধু মাখিয়া রাখিবার জন্য, দুঃখ চাই।

সকল বলবীর্য্যের মূলীভূত উৎস ভগবান্ স্বয়ং। তিনি নিজে অসীম অনন্ত হইয়া নামের শক্তিকেও অসীম অনন্ত করিয়াছেন। নামের মধ্য দিয়াই তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিয়া মানুষ দুঃখকে অনায়াসে অগ্রাহ্য করে। নামকে যখন ভোল নাই, তখন তুমি কাপুরুষ কিসের? ভগবানের নামের মধু পান করিয়া যাহারা মাতাল হয়, নামের মাতলামী করিয়া যাহারা সংসারের তাপ ভুলিয়া থাকিতে চায়, নামের রসে মৃতসঞ্জীবন লাভ করিয়া যাহারা কর্ম্মরণাঙ্গনে হুহুঙ্কারে আপতিত হয়, তাহারা যদি কাপুরুষই হয়, তবে এমন কাপুরুষকুল গর্ভে ধারণ করিয়া ভারতের জননীরা কৃতার্থা হউন, ইহাই প্রার্থনা করি। সংসারের অসহ্য দুঃখ-কষ্টে নিপীড়িত হইয়া যদি ভগবানের চরণের ছায়ায় আশ্রয় পাইবার জন্য ছুটিয়া যাও, আর সেই পরমাশ্রয় লাভ করিয়া পুনরায় ছুটিয়া আইস দুঃখমেধ যজ্ঞের ত্রিলোকলেহী প্রলয়াগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে, তুমি ত' শূরশ্রেষ্ঠ! কেহ হয়ত তোমাকে ভীরু বলিতে পারে, কিন্তু এমন ভীরুরাই দেশের কলঙ্ক ও জাতির মালিন্য ঘুচাইয়া তাহাকে নির্ম্মোক-নির্ম্মুক্ত সর্পরাজ বাসুকীর ন্যায় নবযৌবন-সম্পন্ন ও সামর্থ্য-মণ্ডিত করিবে।

দুঃখ দেখিয়া হা-হুতাশ করিলে ফাঁসীর দড়ির মত দুঃখের পেষণ অধিকতর তীব্র হয়। দুঃখ দেখিয়া শ্রীভগবানের নামাশ্রয় করিলে দুঃখ আপনি প্রাণভয়ে দূরে সরিয়া যায়; অথবা ভগবানের নামের বলে মানুষ বৃহত্তম দুঃখকেও তুচ্ছতম তৃণের মত অবহেলে অগ্রাহ্য করে; ভগবানকে চিরকালের জন্য আপনার বলিয়া জানিলে দুঃখ কখনও দুঃখদায়ী হয় না, নিজেকেই সে নিজে হনন করে।

দুঃখ আমাদের পরম বান্ধব, শত্রুবেশধারী কল্যাণকারী সুহৃদ, স্ফোটকে অস্ত্রোপচারের ন্যায় চরমে শান্তিপ্রদ সহায়। অতএব দুঃখ পাইলে আনন্দই করিও।

এ-দেহ জগৎ-কল্যাণের জন্য ধারণ করিয়াছ। রক্তমাংসের ক্ষুধা-তৃষ্ণাকে পদদলিত না করিলে তুমি তোমার যোগ্য থাক না। যখন তোমার পতনলোভাতুর মন রক্তমাংসকেই বড় করিয়া দেখে, তখন দুঃখই তোমার আত্মরক্ষার অক্ষয় কবচ।

দুঃখে তুমি অভিভূত হইও না। জগতের দুঃখ দূর করা যাহাদের জীবন-ব্রত, ব্যক্তিগত দুঃখবোধ তাহাদের থাকা সঙ্গত নহে। ভগবান তোমার কুশল করুন। ইতি

আশীর্বাদক

তোমার আপনার জন।

ত্রিংশ পত্র

স্নেহের —,

* * * সমাজের মামুলী জাতিভেদ আজ আর টিকিতে পারে না, অস্পৃশ্যতা ও অপাংক্তেয়তার ঠাঁই নবযুগের নূতন সমাজে নাই। যাঁহারা বিধাতার চক্ষে সমান বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন, মানুষের মনগড়া প্রলাপোক্তির মান রাখিবার জন্য তাঁহাদিগকে অসমান করিবার দিন অনেককাল হইল ফুরাইয়া গিয়াছে। যতদিন অলস পরনিন্দায় জাতীয় জীবন গা ভাসাইয়া দিয়াছিল, ততদিন এ সব খেয়ালের হুকুম মানা চলিত, মেজাজী মতলবের ধার ধারা সম্ভব হইত। আজ কর্ম্মেরই যুগ পড়িয়াছে, তপস্যার নব-আহ্বান আসিয়াছে। এ-যুগে যিনি প্রকৃত তপস্বী হইবেন, তিনিই কুলীন বলিয়া গণ্য হইবেন। সর্ব্বদা সর্ব্বত্র পূজা পাইবেন। আমরা তপস্বী চাই, পরার্থে উৎসর্গীকৃত জীবন নিষ্কাম কর্ম্মী চাই, জগৎ কল্যাণে উদ্বুদ্ধবুদ্ধি অমৃতের পুত্র কন্যা-দের চরণ-ধূলার স্পর্শ পাইয়া ধন্য মানিতে চাই; আমাদের কাছে তথাকথিত বংশগত কৌলীন্যের কদর থাকিতে পারে না।

ভিতরে সাম্যের এই বুঝ পাইয়াছি এবং ভুল যে বুঝি নাই, ভগবানের প্রতি মুহূর্ত্তের স্নেহ-করুণায় তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। তাই ভিতরের বুঝ বাহিরের কাজে প্রমাণিত হইতেছে এবং

হইবে। মানুষকে কেহ আর বন্য পশু বলিয়া গালি দিতে পারিবে না, মানুষের মনুষ্যত্বকে আর কেহ অগ্রাহ্য করিতে পারিবে না। নিজস্বত্তাকে অস্বীকার করিয়া মানুষের সন্তান যে শুধু রক্তচক্ষুর ভয়ে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে, সে দিন আর নাই।

আমরা মানুষ বলিয়াই সকলে সমান, মানুষ বলিয়াই সকলে ব্রহ্ম-স্বরূপ। আমরা আত্মস্থ হইলেই যে-কোনও মুহূর্তে ভেদ-বিসম্বাদের ক্ষুদ্র গণ্ডী ছড়াইয়া বিরাট ও মহান্ হইতে পারি, ক্ষুদ্রতর সুখ-সুবিধার জন্য সমাজের যে বিধি-নিষেধের সৃষ্টি হইয়াছে, বৃহত্তর কল্যাণের জন্য তাহা অনায়াসে অতিক্রম করিতে পারি। মানুষের মত মানুষ হইলে ভাঙ্গার মত ভাঙ্গাও যায়, গড়ার মত গড়াও যায়। তপস্যার উগ্রতায় সৃষ্টির শক্তি যাহারা লাভ করে নাই, তাহারা ভাঙ্গিতে গেলেও ভাঙ্গিতে পারে কৈ? যতটুকু আঘাত তাহারা দেয়, তার শত গুণ প্রতিঘাত পাইয়া তাহাদের অসিদ্ধ জীবন কেবল ব্যর্থতায় কাঁদিয়া মরে। আমরা যে মানুষ, এই কথা ঠিক ঠিক বুঝিলে আমাদের পক্ষে জাতিভেদ নাই,—নাই,—একেবারেই নাই। আর যদি উপলব্ধির অপেক্ষা না রাখিয়া কবিত্বের উচ্ছ্বাসেই কেবল সাম্যের গীতি গাহিয়া যাই, স্রোতস্বিনীর তরঙ্গময়ী কুলু-ধ্বনি শুনিবার জন্য কদাচিৎ দুই একজন পথিক আমার পাশে

আসিয়া নিবিষ্ট-শ্রবণে দাঁড়াইলেও দাঁড়াইতে পারে কিন্তু নিশ্চয়ই সে ঐ প্রবাহে জীবন ভাসাইয়া দিতে চাহিবে না। বাহিরের আচরণে প্রকাশ পাউক আর না পাউক, তপস্যার শক্তিকে ত্রিজগতে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না; আবার বাহিরের চটকে দুই চারিজন বোকা ভুলিলেও সেয়ানা ভুলিবে না।

জাতিভেদের দুর্গ অবশ্য চূর্ণ হইবে, অন্ততঃ বর্ত্তমানে যে আকারের জাতিভেদ চলিয়াছে, তাহা বেশীদিন টিকিবে না। কিন্তু যুক্তি দিয়া নয়, তর্ক দিয়া নয়, কবিত্ব দিয়া নয়, পাণ্ডিত্য দিয়া নয়, একমাত্র তপস্যার শক্তিতেই ইহাকে ধ্বংস করা সম্ভব হইবে। সমগ্র ভারত ক্রুপ কামানের অনল বর্ষণে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেও জাতিভেদ ততক্ষণ পর্য্যন্ত যাইবার নয়, যতক্ষণ না তপস্যার অনল বর্ষণ করিতে পারিতেছ। কারণ, ইহা যতই কদর্য্য আকার ধারণ করিয়া থাকুক না কেন, ইহার প্রতিষ্ঠার মূলে যে একটা যথার্থ সত্য রহিয়াছে, ইহা ত' অস্বীকার করিতে পার না। জাতিভেদকে শুধু তখনই মারিতে পারিবে, যখন উহার মূলগত প্রকৃত সত্যটুকুকে মর্য্যাদা দান করিবে।

তোমাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য-শক্তির স্ফুরণ চাই। তবেই তোমরা ব্রাহ্মণ হইবে এবং ব্রাহ্মণরূপে পরিগৃহীত হইবে। যাহারা ওকালতী করিয়া খায়, তাহাদিগকে ডাক্তার বলা চলে না; যাহারা রোগী চিকিৎসা করিয়া জীবিকার সংস্থান করে,

তাহাদিগকে ইঞ্জিনিয়ার বলা চলে না ; যাহারা হাঁড়ী, কলসী, ঘট, প্রতিমা বানায়, তাহাদিগকে দর্জ্জি বলা যায় না ; যাহারা জুতা সেলাই করিয়া খায়, তাহাদিগকে কেহ ছুতার-মিস্ত্রী ব'লয়া ডাকে না। ব্রহ্মশক্তিই যাঁহার উপাস্য, ব্রহ্মশক্তিই যাঁহার উপাসনার অভিব্যক্তি, ব্রহ্মশক্তিই যাঁহার জীবিকা, ব্রহ্মশক্তিই যাঁহার আশ্রয়, তিনি যে ঘরের ছেলেই হউন না, তাঁহাকে ব্রাহ্মণই বলিব, যোগী, জোলা বা তাঁতী, কামার, কুমার বা দর্জ্জি, হাঁড়ি, ডোম বা চামার বলিব না। মেথরের ঘরের ছেলে হইলেও তিনি ব্রাহ্মণ, ডোমের ঔরসজাত হইলেও তিনি মহা-পুরুষ, বেশ্যাজঠরজাত হইলেও তিনি নমস্য।

সমাজে তোমাকে অকুলীন বলে, ছোট জাত বলে, এ সব বাজে চিন্তা একেবারে ছাড়িয়া দাও। কুলীন হইবার জন্য তনুমন দিয়া তপস্যা কর। যাঁহার উপাসনা করিয়া বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, তুমি তাঁহার উপাসনাতে জীবন সমর্পণ কর। * * * সাধনের জোর থাকিলে বুদ্ধ, শঙ্কর, নানক, চৈতন্যকে লোকে যেমন মানিয়াছে, তোমাকেও তেমন মানিবে। অকপট জগৎ-হিতৈষণা থাকিলে ব্রহ্মসাধনের তুচ্ছ প্রয়াসটুকুও বৃথা যাইবে না। 'নহি কল্যাণকৃত কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।' * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

আপনার জন।

একত্রিংশ পত্র

৯ই আষাঢ়, ১৩৩১

পরম-প্রীতি ভাজনেষু—

লেখাপড়ার জোয়ালে যখন একবার কাঁধ জুড়িয়া দিয়াছ, তখন ঘাড়ে কড়া পড়িবার আগে যে ইহা ছাড়িবে, এমন মনে হয় না। চোখ-বাঁধা বলদকে যেমন কলুর ঘানীতে জুড়িয়া দিলে তার গত্যন্তর নাই; ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, টানিতেই হইবে। এই কথা কেবল তোমার পক্ষেই খাটিবে, তাহা নহে; বস্তুতঃ সমগ্র দেশ জুড়িয়া খুঁজিলেও ইহার ব্যতিক্রমস্থল পাওয়া শক্ত। কেন না, আজিকার যুগে শিক্ষা ব্যাপারটা হাত-পা বাঁধিয়া নাকের মধ্য দিয়া উদরে রবারের নল ঢুকাইয়া জোর জবরদস্তিসে ভোজপুরী জুটার মণ্ড খাওয়ান'র সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তোমার ক্ষুধা থাকুক আর না থাকুক, খাইতেই হইবে; ভাল লাগুক আর না লাগুক, গিলিতেই হইবে। গত্যন্তর নাই। অর্থাৎ টাকা পয়সা খরচ করিয়া তোমরা যে শিক্ষা লাভ কর, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে দাসত্ব ব্যতীত আর কিছুই নহে। তোমার শিল ও তোমার নোড়া দিয়া তোমারই দাঁতের গোড়া ভাঙ্গা হইতেছে। তোমার শক্তি এবং তোমার সামর্থ্য তোমারই স্বাধীন বুদ্ধি, স্বাধীন বৃত্তি এবং স্বাধীন প্রতিষ্ঠার পাদমূলে কুঠার হানিবার জন্য প্রয়োগ করা হইতেছে;

তুমি অবোধ শিশুর মত নির্ব্বিবাদে তাহার সমর্থন করিতেছ, ইহাই দাসত্ব।

আত্মবিস্মৃতি দাস-মনোবৃত্তির জননী। যাহা কিছু আত্মবোধ, আত্মমর্য্যাদাবোধ এবং আত্মকুশলবোধকে প্রতিহত বা পদাহত করে, তাহাই দাসসুলভ ভীরুতা, কাপুরুষতা, অধ্যবসায়হীনতা, আত্মাবমাননশীলতা প্রভৃতিকে ডাকিয়া আনে। শিক্ষার প্রারম্ভে তোমরা মূল্য দিয়া আত্মবিস্মৃতি কিনিয়া আনিয়াছ, তাই তাহারই প্রসূত দাসত্ব তোমাদের ঘাড় ভাঙ্গিয়া রক্ত চুষিতেছে।

যথার্থ শিক্ষা মানুষের দুর্ব্বল মেরুদণ্ড সবল করে, কুব্জপৃষ্ঠ সরল করে, অবনমিত মস্তক উত্তোলিত করে। আর, যে শিক্ষা তোমরা পাইতেছ, তাহা তোমাদের পিঠের উপরে বৃথা বোঝা চাপাইয়া প্রাণান্তকারী যন্ত্রণার সৃষ্টি করিয়াছে। মানব-জীবনের দুঃস্থ মুহূর্ত্তের জন্য শিক্ষা এক অব্যর্থ পাশুপত অস্ত্র, ইহা মানুষকে সকল হিংস্রতার আক্রমণ হইতে স্বাধীন এবং স্বচ্ছন্দ রাখে; আর, তোমাদের শিক্ষা তোমাদিগকে দৃষ্টিক্ষীণতা হইতে ক্ষীণায়ুষ্কতায় টানিয়া নেয়, দৈহিক অস্বচ্ছন্দতা হইতে ক্রমশঃ রাজযক্ষ্মার খর্পরে বলি দেয়। শিক্ষার হিমাচলনিন্দী চাপে তোমাদের পৌরুষ চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, শিক্ষার প্রচণ্ড তাপে তোমাদের মনুষ্যত্ব দহিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে।

এই শিক্ষার জন্য অর্থ দাও কেন- তাহাই ত' জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমার উত্তর অতি সহজ, অতি সরল। তোমরা

রিতে চাহ, বাঁচিয়া মরিয়া থাকিতে চাহ, মরিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিতে চাহ, তারই জন্য এই শিক্ষাকে চাহিয়া থাক। তোমরা টাকার জন্য লেখাপড়া কর, তাই লেখাপড়ার জন্য টাকা খরচ কর। মনুষ্যত্বের জন্য পুরুষত্বের লেখাপড়া তোমরা কর না, তাই তোমরা পড়াশুনা করিতে পুরুষত্বের বা মনুষ্যত্বের প্রয়োগ কর না। ক্লীব রহিয়াও তোমরা টাকা পাইলে খুসী, দীন-দরিদ্র থাকিয়া তোমরা পৌরুষদীপ্ত নির্ম্মল নির্ভীক জীবন পাইতে অসন্তুষ্ট। তাই তোমরা স্কুলে পাঠশালায় ঢুকিয়াছ।

যদি তাহাই না হইত, তাহা হইলে তোমরা নিজেদের জীবনকেই এক একটী বিদ্যায়তন করিয়া লইতে এবং সেই পাঠশালায় জীবন-বেদ অধ্যয়ন করিতে; জীবনের অতীত অভিজ্ঞতায় বর্ত্তমানকে সুষ্ঠুরূপে নির্ম্মাণ করিতে তোমরা আপ্রাণ প্রয়াস পাইয়া অনায়াসে ভবিষ্যতের জন্য আনন্দলোক নির্দ্ধারণ করিয়া লইতে; বাহিরের কলকোলাহল অগ্রাহ্য করিয়া পরমানন্দ সাগরের অগম জলে নীরব নিথর ভাবে স্নান পাইতে; পাত্রাপাত্র, ক্ষেত্রাক্ষেত্র, স্থানা-স্থান বেশী বিচারে না আনিয়া অকুণ্ঠ তপঃশক্তির প্রভাবে জগৎকল্যাণে ছোট বড়, ধনী-দরিদ্র সকলকে অক্ষোভ অন্তরে সম্মিলিত করিতে পারিতে; শত শত অখণ্ডনীয় যুক্তি-প্রমাণের বোঝা বহিয়া যে লাভ নাই, একটী মাত্র সিদ্ধান্তে আস্থা ন্যস্ত করিয়া স্নিগ্ধ আশার অমল আলোকে পথ চলিবার প্রয়াস যে শ্রেয়ের শ্রেয়, তাহা সহজেই বুঝিতে

পারিতে ; জনসমাজে খ্যাত হইলাম আর অখ্যাতই রহিলাম তাহা না ভাবিয়া একান্ত মনে অখেদ চিত্তে নিজেরই বিবেকানুকূল কর্ম্মের পথে দুঃখ সহিয়াও, বেদনা পাইয়াও অগ্রসর হইতে।

মৃত্যুকালে সংসারের প্রতি বস্তু আসিয়া তোমায় গালি দিয়া যাইবে, তোমার ধন-দৌলত তোমাকে ভৎর্সনা করিবে, তোমার চাকুরী-নকরি তোমাকে বিদ্রূপ-বাণে আক্রম করিবে, তোমার পরতোষণ জড়ভাষণ তোমাকে মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্ধ করিবে। তোমার সম্মুখে যেমন প্রত্যহ উৎকৃষ্টরূপে সুসজ্জিত সোপকরণ অন্ন পরিবেশিত হয়, তুমি-আমি লইয়া বিশ্বজগতের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল প্রাণীও তেমনই অনন্ত-বিস্তার থালিকায় মহাকালের গ্রহণ-যোগ্য পরিবেশিত হইয়া আছি। অনন্তময়ের অনন্ত লীলায় কখন যে কেমন করিয়া যোগদান করিয়া যোগযুক্ত হইব, কৃতকৃতার্থ হইব, তাহা কে জানে ? আর কি আমাদের স্বরূপ ভুলিয়া, অবুঝে বুঝিয়া মোহবশে চক্ষু বুঝিয়া খেয়ালে মজিয়া থাকিবার অবসর আছে ?

অকাল পড়িলে লোকে দাসবৃত্তি লইয়াও বাঁচিতে চাহে, তাহা দেখিয়াছি,—কিন্তু জীবিত মানুষ যে কখনও দাসত্বশৃঙ্খল ভাঙ্গিতে চাহে নাই, ইহা শুনি নাই। নিজেদের কল্যাণ-অকল্যাণ সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ প্রভৃতির বোধে বঞ্চিত হইয়া অকারণে আমরা মানুষ বলিয়া পরিচয় দিতেছি। আমাদের লম্ফঝম্প,

আস্ফালন নিরর্থক। আমাদের চক্ষু অন্ধ বলিয়া কলঙ্কীকে আমরা অকলঙ্ক বলিয়া বরণ করিয়াছি, চোরকে সাধু বলিয়া পূজা করিয়াছি, মহান্ বলিয়া নীচতা ও অপকর্ষের আরাধনা করিয়াছি। যদি বা কচিৎ কদাচিৎ আমরা ক্ষণকালের জন্য আত্মসম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়াছি, তাহা হইলেও আমাদের যুক্তি অপেক্ষা ব্যক্তিগত জেদ, অনুপ্রাণতা অপেক্ষা বাহিরের আড়ম্বর অধিকাংশ সময় বেশী অকাট্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এই ত' আমরা! ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী

আপনার জন।

দ্বাত্রিংশ পত্র

স্নেহের—,

দেহ আর আত্মা এক নহে। তুমি দেহাতীত সুমহান্ অস্তিত্ব। দেহের পঙ্গুত্ব বা খর্বতা তোমার বৈশিষ্ট্য বিকাশে বাধা দিতে পারে সত্য, কিন্তু দেহ ভাঙ্গিলে তুমিও সঙ্গে সঙ্গে ভাঙ্গিয়া পড় না। দেহ মাটিতে মিশিলেও তুমি আছ, আগুনে পুড়িলেও তুমি আছ। দেহের রোগ, দেহের ক্ষয়, দেহের অসামর্থ্য তোমার অস্তিত্বকে মিথ্যা করিয়া দিতে পারে না।

মানুষ 'মানুষ' বলিয়াই পদে পদে তার এত বিঘ্ন, এত বাধা। বাধা না থাকিলে পর্বত-লঙ্ঘনের গৌরব কমিয়া যাইত, স্রোত

না থাকিলে নদী-সন্তরণের প্রশংসা দুর্লভ হইত। সুখসমুদ্রের সকলগুলি তরঙ্গই দুঃখের।

ক্ষুধিত ব্যক্তি আহার্য্যকে যেমন মনে করে, তৃষিত ব্যক্তি সুশীতল জলকে যেমন মনে করে, রুগ্ন ব্যক্তি সুস্বাদু ঔষধকে যেমন মনে করে, শ্রান্ত ক্লান্ত পথিক বটচ্ছায়াকে যেমন মনে করে, ভগবানকে তুমি তেমনি মনে করিও। ভগবান্ তোমার ঘনান্ধকারের আশার বাতি, তোমার অবসাদ-বেদনার উৎসাহ-প্রেরণা, তোমার সাধন-আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি, তোমার জীবন-মরণের শেষশরণ হউন। তবেই তুমি ব্রহ্মচারী হইবে।

ঝাঁকী দিয়া টাকী মাছ পাওয়া যাইতে পারে, শোল মাছ পাওয়া যায় না। বাকীতে মুড়ি মুড়কী কেনা যাইতে পারে, রাজত্ব কেনা যায় না। ভগবানের বা নিজের মধ্যে যাবতীয় চিত্তবৃত্তির উদাম উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষা যদি পরিতৃপ্তি না পায়, তবে তাহাদের আর নিঃশেষ নাই। বংশের পর বংশ বাড়িয়া কামনার গোষ্ঠি বেতঝাড়ের মত চিরস্থায়ী হইয়া বসিবে। সীমাবদ্ধ দেহের মধ্যে আসিয়া অসীম আত্মার অনন্ত শক্তির বিকাশ শান্ত হইয়া পড়ে, অসীম সসীম হয়। মানুষের ভোগলিপ্সা, মানুষের রূপোন্মাদনা, মানুষের ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা ঐ সীমাবদ্ধতার প্রমাণ। অসীমে সসীমে যে অপূর্ব্ব মধুর সম্বন্ধ, সসীম জগতের কামতাড়না তাহারই একটা ব্যর্থ অনুকৃতি। আত্মার প্রসার শুধু নারীর রূপকেই স্পর্শ করিল, এই রূপের পশ্চাতে যাঁর তেজ, যাঁর

দীপ্তি, এই কমনীয়তার পশ্চাতে যাঁর কোমলতা, যাঁর সুষমা, তাঁর পানে চাহিয়া দেখিল না, এ কেমন কথা ?

যে ভগবান্ বিশ্ব জুড়িয়া আছেন, সে ভগবান তোমার এই ভোগায়তন দেহেও আছেন, তোমার চিত্তের যাবতীয় উত্তেজনার হেতুভূত ঐ ভোগযোগ্য নারীদেহেও আছেন। এই কথাটী একবার বুঝিয়া দেখ ত' বাছা! কাম পলাইবার পথ পাইবে না। শুধু প্রকাশ্য কাম অর্থাৎ যে কাম তোমার মনের কাছেই ধরা পড়িয়া যায়, সেই কামই গুড়িগুড়ি মারিয়া চম্পট দিবে, তাহা নয়। যে কাম তোমার স্থূলমনের অজ্ঞাতে আত্মবিস্তার করে, যাহা ধ্যান-প্রশান্ত মন ব্যতীত অপরের কাছে ধরা পড়ে না, যে অপ্রকাশ্য কাম তোমার স্বপ্নের দুর্দ্দৈব, নিদ্রার দুর্ভাগ্য, সেই দেহ-বিধ্বংসী প্রচ্ছন্ন কামও এই ভগবদ্বুদ্ধির কাছে প্রতিহত ও পরাভূত হয়। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক
আপনার জন

ত্রয়স্ত্রিংশ পত্র

স্নেহের—,

* * * সর্ব্বাগ্রে আজ একদল সংসারবুদ্ধিত্যাগী, পরার্থ প্রেমিক, অকুতোভয় কর্ম্মীর প্রয়োজন। দোটানায় পড়িয়া

যাহারা নিজেদিগকে বিপন্ন করিয়া রাখিয়াছে, জাতির বিপদ দূর করিবার ক্ষমতা তাহাদের অধিক পরিমাণে, বা সকল সময় থাকিতে পারে না। আজ নূতন করিয়া জাতি সৃষ্টি করিতে হইবে। এই জন্য ত্যাগপ্রবুদ্ধ, আত্মবোধবর্জ্জিত, উৎসর্গ-সঙ্কল্প একদল কর্ম্মী চাই।

সকল জাতির মধ্যেই, যখনই অবনতি প্রলয়-মূর্ত্তি ধরিয়া প্রকটিত হইয়া উঠে, তখনই একটা অপৌরুষের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একদল অথবা বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন দল সংস্কারকের আবির্ভাব হয়। ইহারা জীবন মরণ পণ করিয়া উদ্দেশ্য সাধনে লাগিয়া যান এবং হয় মন্ত্রের সাধন করিয়া নতুবা শরীর পাতন করিয়া ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হন। আজ আমাদের দেশেও তেমন মরণব্রতী কর্ম্মীর প্রয়োজন পড়িয়াছে।

বিশাল দেশ, বিরাট জাতি,—এ দেশে মুষ্টিমেয় কর্ম্মী হইলে চলিতে পারে না। দেশ জোড়া শত শত মত, শত শত পথ,—এমন অবস্থায় অধঃপতনের গতিবেগ প্রহত করিতে হইলে একটী মাত্র নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য লইয়া গঠিত সঙ্ঘ দ্বারা সম্যক্ কার্য্য হইবে না। শত শত সঙ্ঘ গঠিত হইবে এবং নিজ নিজ কর্ম্মের ব্যাপকতা দিয়া ইহারা শত প্রকারে জাতির মধ্যে গঠনমূলক উপাদান সঞ্চয় করিবে। তাই আজ প্রকৃত কর্ম্মীকে উদার, নির্ম্মৎসর এবং সকল কল্যাণকারীর সমর্থনকারী হইতে হইবে। সমগ্র দেশকে একটা মাত্র সঙ্ঘের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ করিবার জন্য

নিরর্থক চেষ্টা না করিয়া, নিজ নিজ অকপট আবেগে প্রাণান্ত সাধন করিতে হইবে। যে-কেহ যে-কোন স্থানে যে-কোনও ভাবে দেশ-কল্যাণে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাকে পরিপূর্ণ চিত্তে শ্রদ্ধা করিতে পারার নামই প্রকৃত সঙ্ঘ-শক্তি। সম্প্রদায় গড়িলেই সঙ্ঘ-শক্তি জাগে না ; দল হইলেই বল হইল, এমন নহে। যেখানে মানুষ নিঃস্বার্থ ভাবে জগতের কল্যাণ চাহিয়াছে, সেখানেই সে সর্বদা সকল সঙ্ঘবুদ্ধির অতীত হইয়া এক মহা-সঙ্ঘের অন্তর্বর্ত্তী হইয়াছে। যে সঙ্ঘ-শক্তির অভাব আজ ভারতে বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে, তাহা এই মহাসঙ্ঘ-শক্তি। যাহারা এই মহাসঙ্ঘের শক্তিকে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাদিগকে "মহাসঙ্ঘী" বলিতে পারি। নিজে যে কার্য্যটির সমাপ্তিকল্পে আজীবন তপস্যা করিয়া আসিতেছেন, অপর কেহও সামান্য শ্রমে তাহা করিয়া যশস্বী হইলে মহাসঙ্ঘী রুষ্ট বা ঈর্ষ্যাবান্ হন না। জগৎ-কল্যাণই তাঁহার কাম্য, নিজে করিয়া উঠিতে পারেন নাই,—অপরে করিতে পারিয়াছেন, ইহা ত' সুখেরই কথা! মহাসঙ্ঘীর চিত্তে যশোলিপ্সা নাই, নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কামনা নাই,—আছে শুধু নিষ্কাম জগৎ-কল্যাণী প্রেরণা।

যতই চেষ্টা কর না কেন, জগতের সকল লোককে কখনও একটা নির্দ্দিষ্ট সঙ্ঘের মধ্যে আনিতে পারিবে না। আবার যতই প্রয়াসী হও না কেন, সঙ্ঘ গড়িবার যে স্বাভাবিকী প্রেরণা

জীব মাত্রেরই অন্তরে ভগবান্ দিয়া দিয়াছেন, তাহারও বিলোপ সাধন করিতে পারিবে না। জীব যতক্ষণ শিব না হয়, ততক্ষণ সে দেহ মন ও পৃথিবীর সীমাবদ্ধতার প্রভাবকে অতিক্রম করিতে পারে না। ততক্ষণ সে মহাসঙ্ঘ গড়িবার প্রেরণাকে সীমাবদ্ধ সঙ্ঘ গড়িতেই প্রয়োগ করে এবং দিকে দিকে শত শত সীমাবদ্ধ সঙ্ঘ গড়িয়া সৃষ্টির বৈচিত্র্যের সাক্ষ্য দেয়।

তোমাদিগকে আজ জগতের প্রত্যেকটী সীমাবদ্ধ সঙ্ঘকেই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, প্রত্যেকেরই প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সকলেরই কর্ম্মপ্রয়াসে যথাসাধ্য সহায়তা দান করিতে হইবে, সকলেরই সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ করিতে হইবে, সকল সঙ্ঘকেই নিজের সঙ্ঘ বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। আজ দেশে এইরূপ কর্ম্মীরই অভাব, নতুবা অপর সঙ্ঘের প্রতি ঈর্ষ্যা-পরায়ণ কর্ম্মীর অভাব কোথায়? শত শত কর্ম্মী নিজ নিজ আদর্শের চরণে অবহেলে আত্মবিসর্জ্জন করিতেছেন কিন্তু হায়, তাহারা পরমতে সহিষ্ণুতা দেখাইতে না পারিয়াই নিজেদের মানুষোচিত জীবনোৎসর্গকেও অনেক গৌরব হইতে বঞ্চিত রাখিতেছেন। জীবন্মুক্ত-পুরুষও যেমন সীমাবদ্ধ দেহ ও মনের প্রতিবেশকে অগ্রাহ্য করেন না, মহাসঙ্ঘী পুরুষও তেমনি সীমাবদ্ধ সঙ্ঘের প্রভাবকে উপেক্ষা না করিতে পারেন। শাস্ত্র বলিয়াছেন, বিদেহী দেবতারাও মুক্তিলাভের জন্য অমুক্ত মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া থাকেন। ঠিক্ তেমনি মহাসঙ্ঘী মহাপুরুষেরাও সঙ্ঘের

সীমাবদ্ধতাকে নিজ জীবনের কর্ম্ম হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য আবার সীমাবদ্ধ সঙ্ঘকেই গ্রহণ করেন। ব্যাপারটা যেন কণ্টকেনৈব কণ্টকম্। প্রতীকোপাসক যেমন সরূপ বিগ্রহকে ধরিয়া অরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করেন, মহাসঙ্ঘীও তেমনই পূর্ব্বে নিজেকে নির্দ্দিষ্ট একটী সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। নাম-রূপের পাথেয় লইয়াই অনেককে নামরূপের অতীত পথে ছুটিতে হয়। এই নাম এবং এই রূপ বিভিন্ন আধারের আধ্যাত্মিক উপযোগিতা বুঝিয়া বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে সন্দেহ নাই। কিন্তু নির্গুণকে বুঝিতে হইলে অধিকাংশকেই আগে সগুণের আস্বাদন পাইতে হয়।

আমরা দেখিয়াছি, এক মহাপ্রাণ পুরুষ আসিয়া এক সঙ্ঘ গড়িলেন, আর শত শত ব্যক্তি আসিয়া দেশরক্ষী স্বেচ্ছা-সৈনিকের মত নিজেদিগকে সঙ্ঘের তালিকাভুক্ত করিয়া লইল। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যাপারটা ঠিক তাহাই নহে,—আমাদের দেখার মধ্যে কিছু অসম্পূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে। যে প্রেরণায় সঙ্ঘপ্রবর্ত্তক পুরুষ সঙ্ঘের ভিত্তি স্থাপন করিলেন, সেই প্রেরণা প্রত্যেকেরই প্রাণে অল্পবিস্তর জাগিতেছিল, আধারের অশুদ্ধতার দরুণ তাহার বহিঃবিকাশ সম্ভব হয় নাই, পরন্তু ঘটনার যোগাযোগ এই অশুদ্ধতার আবরণ তুলিয়া ফেলিয়াছে মাত্র। একজনের মধ্যে তপস্যার অনল আর সকলের অপেক্ষা বেশী করিয়া জ্বলিতেছিল এবং যাবতীয় সঙ্কীর্ণতা ও অশুদ্ধতাকে দগ্ধ করিয়া দিতেছিল।

যেই তাঁহার তপঃপবিত্র জীবনের মধ্য দিয়া প্রেরণা অপরূপ বিকাশ পাইয়া ফুটিয়া উঠিল,অমনি আর সকলে নিজেদের গুপ্ত প্রেরণাকে তাঁহার মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহারই নেতৃত্ব স্বীকার করিল। এই নেতৃত্ব স্বীকারের অর্থ—সঙ্ঘ-প্রবর্ত্তক পুরুষের দাসত্ব স্বীকার নহে,—তিনি যে আমাদেরই সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার মূর্ত্ত বিগ্রহ, তাঁহার স্বীকৃতি, তাঁহার বুদ্ধত্ব স্বীকৃতি।

ইঁহারা সংগঠন করেন, ইহাই বলিয়াছি বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সঙ্ঘ আপনি গঠিত হইয়া যায়। কাহারও কোন চেষ্টার অপেক্ষা না করিয়া সকলের সমবেত কল্যাণেচ্ছা সঙ্ঘের মূর্ত্তি ধারণ করে। যতদিন সঙ্ঘ অভিনয়ে পরিণত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত ইহাদের চির অমর জীবনের ন্যায় সঙ্ঘও অমর হইয়া থাকিবে।

এই পর্য্যন্ত লিখিয়াছি, এমন সময়ে অন্য কাজের তাড়া পড়িল। আমাকে পরে মনে করাইয়া দিও, এই বিষয় পুনরারম্ভ করিব।

আশীর্ব্বাদক

আপনার জন

চতুস্ত্রিংশ পত্র

স্নেহের—,

* * * যথার্থ সংগৃহী বর্ত্তমান যুগে একান্ত দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই দিগ্‌দেশব্যাপী ঘোরতর অশান্তি, অসন্তোষ ও উদ্বেগের রাজত্ব চলিয়াছে। বংশানুক্রমিক জড়তা ও পঙ্গুতা

জন্মজন্মান্তরীণ আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতার সাথে সাথে শুধু এই একটী কারণেই চিরস্থায়ী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গৃহীরা যথার্থ গৃহী নহে বলিয়াই যথার্থ ব্রহ্মচারীরা, প্রকৃত সন্ন্যাসীরা, নিষ্কলঙ্ক সাধু-সজ্জনেরা, জগতের অকপট হিতৈষীরা অতিশয় অল্প সংখ্যায় এ জগতে অবতীর্ণ হইতে পারিতেছেন। গৃহীজীবনে সত্য, ধর্ম্ম, ন্যায় ও নির্ভর কণিকা-প্রমাণ আশ্রয়-ভূমি পাইতেছে না বলিয়াই, অসাধুতা সাধুতার মুখোস পরিয়া প্রতিষ্ঠা পাইতেছে। অন্যায় ন্যায়ের ছদ্মবেশ ধরিয়া সসাগরা ধরিত্রীর উপরে রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেছে।

তাই, আজ গৃহী চাই। গৃহধর্ম্মের গৌরব যাহাদের হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে, গার্হস্থ্যের সমগ্র পবিত্রতা যাঁহারা তপস্যার বলে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, তেমন গৃহী চাই। বিবাহ সংস্কারকে যাহারা 'সমাজানুমোদিত ব্যভিচার মাত্রে (legalised prostitution) পরিণত করে না, গার্হস্থ্য আশ্রমকে যাহারা ইন্দ্রিয় সম্ভোগের সুযোগ বলিয়া গ্রহণ করে না, পরন্তু বিবাহিতা নারীকে যাহারা মাতৃত্বের বিগ্রহ-স্বরূপ দর্শন করিয়া আপন শ্রদ্ধায় পুরুষানুক্রমিক শ্রদ্ধাকে প্রতিষ্ঠিত করে, তেমন গৃহী চাই। যে গৃহী গৃহীর আদর্শ, ব্রহ্মচারীর জনয়িতা এবং সন্ন্যাসীর গুরু, তেমন আত্মস্থ ও আত্মজ্ঞ গৃহী চাই।

সৎগৃহীর প্রথম লক্ষণ, ভগবানে পরিপূর্ণ নির্ভর। ভগবানে নির্ভরশীল বলিয়াই তিনি সৎকার্য্য করিয়া অহঙ্কার করেন না,

বিপন্ন হইয়াও হা-হুতাশ করেন না। তিনি সর্ব্বাবস্থায় সুস্থির ও নিত্য-তৃপ্ত, নিবিড় আনন্দ তাঁহার সমগ্র অস্তিত্বজোড়া। ভগবানকে হৃদয়ের আসন ছাড়িয়া দিয়াছেন বলিয়া, বিবাহিত-জীবন যাপন করিয়াও তাঁহার মধ্যে কাম-কোলাহল বা লালসার হুঙ্কার নাই ; তিনি বিশ্বাত্মার পরিতৃপ্তি অংশাত্মার পরিতৃপ্তিতেই লাভ করিতেছেন বলিয়া, "দিন্‌কী মোহিনী, রাত্‌কী বাঘিনী" লইয়া ঘর করিয়াও তিনি আত্মরক্ষায় নিয়ত সুসমর্থ, চিত্তসংযমে সর্ব্বদাই অক্ষুণ্ণরূপে সক্ষম ও সুপটু।

তালে বেতালে সবাই মিলিয়া সন্ন্যাসী হইতে না চাহিয়া আজ তোমাদের মধ্য হইতে একদল পবিত্রচেতা সংযমী পুরুষকে গার্হস্থ্যের দীক্ষাও গ্রহণ করিতে হইবে। কেননা, জাতি সৃষ্টির মূল উৎস গার্হস্থ্য। ইহার পবিত্রতা রক্ষার যোগ্য নরনারী যদি দেশ হইতে লুপ্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে অপরাপর আশ্রমও কলুষ-কালিমায় আচ্ছন্ন হইয়াই থাকিতে চাহিবে। * * * ইতি

তোমার

আপনার জন

পঞ্চত্রিংশ পত্র

পরমপ্রীতিভাজনেষু :—

"শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য
ইহার উপরে নাই"—
(চণ্ডীদাস)

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশাদি মানুষ ছিলেন কিনা, সেই কথার ঐতিহ্য আলোচনায় অন্য লাভ যথেষ্ট হইতে পারে, কিন্তু চিত্ত-ভাণ্ডারে রসের সঞ্চয় হয় না। আমরা রসলিপ্সু, মধুর লোভে না করিতে পারি, হেন কাজ নাই,—তাই আমরা মানুষে মানুষে নারায়ণের অবতরণ বিশ্বাস করিয়া মনুষ্যজন্মেরই গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব দেখিতে চাহিয়াছি। মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া যে দেবতাকেও মুক্ত হইতে হয়, পুরাণকার সে কথা বলিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে দেবতারা মানুষ হোন আর না হোন, তাঁহারা পরলোক-প্রস্থিত সূক্ষ্মদেহ-ধারী মানবাত্মাই হউন বা বর্তমান মুহূর্ত পর্য্যন্ত স্থূলদেহে অস্তিত্বশীল মহামানবই কেহ হউন, অথবা পৃথক যে কোনও প্রকার সত্তাই হউন না কেন, সে কথা বুঝাইবার দাবী আমি পূরণ করিতে চাহি না। নিজের বিচারবুদ্ধি দিয়া যাহা বোঝ, তাহাই বুঝিও, অপরের শ্রদ্ধাপূত বিশ্বাসে কখনও অনুমাত্র আঘাত না করিয়া, কাহারও ভাব নষ্ট না করিয়া, নিজের জ্ঞান ও বিশ্বাসের মধ্য দিয়া নিজের প্রকৃষ্ট কল্যাণকেই শুধু প্রার্থনা কর। আন্তরিক প্রার্থীর তর্ক আলোচনার অবসর থাকে না, মতবাদ লইয়া কলহ সৃষ্টি করিতে হয় না। আমার এই কথায় বেশী বলিবার নাই।

তবে, ভগবান তোমার আমার মধ্য দিয়া যে অপরূপ মানুষী লীলার বৈচিত্র্য বিকাশ করিতেছেন, তাহারই মধ্যে আমাদের সম্যক সার্থকতা লুকাইয়া রহিয়াছে বলিয়া আমরা দেবতার

অপেক্ষা মানুষকে বড় করিতে চাহি। ভগবান বা দেবতা যখন মানুষ হইয়া, মানুষের বোধগম্য অবস্থা ও ব্যবস্থার নির্দ্দেশ মানিয়া মানুষের দুয়ারে ভগবানের নাম বিলান, তখনই আমরা তাহা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হই। মহাপুরুষ সম্বন্ধেও সেই কথা। আমার মত হইয়া যদি না আস, ওগো দেবতা কেমন করিয়া আমি তোমাকে বুঝিব, কেমনই বা আমি তোমার মহাবাণী পালন করিয়া ধন্য হইব? আমারই মতন সর্ব্বপ্রকার ভালমন্দের পারিপার্শ্বিকের মধ্যে আসিয়া তুমি নিজে না আচরিলে কেমনে আমি পথ পাইব? দেশকর্ম্মীর সম্বন্ধেও এ-কথার ব্যত্যয় নাই। দীনাদপি দীন ও নীচাদপি নীচের মাঝে যদি পরম-প্রেমসুন্দরের অথবা সুজলা-সুফলা-শ্যামলার মহিমা প্রচার করিতে চাহ, তোমাকে আভিজাত্যের পারিপাট্য ছাড়িয়া অন্ত্যজের সারল্য লইতে হইবে। তাই গাহিয়াছিলাম,—

মন সেথা যেতে চায়,
যেথা,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশাদি
মানুষ হ'য়ে নাম বিলায়।

যদি মানুষ না হও, ওগো সত্ত্ব-রজ-তমোগুণের ত্রিমূর্ত্তি, অথবা ওগো মানুষাতীত সূক্ষ্ম অস্তিত্ব, অথবা ওগো পরলোকবিশ্রান্ত মহান্ আত্মা, অথবা ওগো জগৎকল্যাণ মহা তাপস, অথবা ওগো দোষে-গুণে-গড়া ক্ষমতাশালী সমাজকর্ম্মী,—তোমার কথা কেহ শুনিবে না, তোমার আশার বাণী কেহ বুঝিবে না, তোমার সাধের বারতা বাতাসে মিলাইয়া যাইবে, সমগ্র আকাশের এক

কোণ হইতে একটা প্রতিধ্বনিও আসিবে না। যদি দেবতার দেবত্ব লুকাইতে না পার, যদি তোমার মহামানবত্তার সমুচ্চ দূরত্ব দূর করিতে না পার, যদি তোমার ক্ষমতার প্রাখর্য্য সহৃদয়তার ছাই আর সহানুভূতির মাটি দিয়া ঢাকিয়া ফেলিতে না পার, তোমার প্রতি আমার চিত্ত কিছুতেই উন্মুখ হইবে না; সুতরাং তোমাতে যে শান্তি-নিকেতন রচিয়া তুমি কৃতকৃতার্থ হইলে, তাহা আমাতে রচিতে পারিবে না। তাই একটু পরেই বলিয়াছি,

যেথা, ইন্দ্র ছাড়ে ইন্দ্রপদ,
কুবের ছাড়ে ধনমদ,
হ'য়ে হরিনামে গদগদ
মানুষের পায়ে লুটায়।

মানুষের পায়ে লুটিয়াই দেবতার দেবত্ব; মহতের মহত্ত্ব সার্থক; মানুষের পায়ে লুটিয়া মানুষকে দেবত্ব ও মহত্ত্ব দিয়াছেন বলিয়াই দেবতার বা মহতের গৌরব।

যেথা, হয়ে নামে মাতোয়ারা,
প্রেমেতে আপন হারা,
মানুষেরে বুকে ধরে'
দেবতার হৃদি জুড়ায়।

আধি-ব্যাধি-প্রপীড়িত শোক-তাপ-বিজড়িত মানুষের চিত্তকে নিজের বুকের শীতল ছায়া যিনি না দিয়াছেন, মানুষের দগ্ধপ্রাণে শান্তির অমিয়ধারা বর্ষণ করিতে যাঁর পরমানন্দের উৎস খুলিয়া যায় নাই, তিনি আবার কিসের দেবতা, তিনি আবার কিসের মহৎ?

যেথা, মর্ত্ত্য উঠে স্বর্গভূমে,

স্বর্গ মর্ত্ত্যে আসে নেমে—

তেমন দেবতার সুখসঙ্গ পাইয়া মানুষ সংসারে সীমাবদ্ধ জীবনের বিভীষিকা বিস্মৃত হইয়া অন্তহীন অস্তিত্বের উদ্দাম মাধুর্য্যের আস্বাদ পায়, তাই মর্ত্ত্য স্বর্গ হয়। আবার দৈবী সম্পদ অগ্রাহ্য করিয়া মানুষী লীলার সেবা করিতে যখন মর্ত্ত্যের মরণশীল, পতনশীল, সংঘাতশীল বিব্রত জীবনের মধ্যে আসিয়া দেবতা নিজস্ব কোমলতা ও শান্ততাময় কল্যাণ জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে, গ্রাম–নগর-দেশ-নির্ব্বিশেষে, সুখী-দুঃখী-উদাসী-নির্ব্বিশেষে, কর্ম্মি–অকর্ম্মি-অপকর্ম্মি-নির্ব্বিশেষে, ছড়াইয়া দেন, তখন স্বর্গই মর্ত্ত্যে নামিয়া আসে। দেবতা তখন দেবত্ব তুচ্ছ করিয়া মানুষের হিতার্থে মানুষ হইয়াছেন ; মানুষ এখন মানুষ থাকিতে চাহিবে না কেন ? তাই—

কেহ, দেবতা হতে না চাহে

মানুষে মানস পায়।

মানুষের খণ্ড জীবনেই তখন অখণ্ড পরিতৃপ্তির পথ খুলিয়া যায়। অন্ধ অন্ধ থাকিয়াই চরিতার্থ হয়। খঞ্জ খঞ্জ থাকিয়াই নিজেকে ধন্য মনে করে। ভাগবত জীবন আরম্ভ হইলে মানব জীবনের শত দুঃখ-বেদনা ও অসম্পূর্ণতা থাকিলেও পরমপ্রেমামৃত পারাবারে ক্ষুদ্র তুচ্ছ সুখ দুঃখ সব ডুবিয়া মরিয়া থাকে। ইতি—

তোমার আপনার জন।

(সমাপ্ত)